অ শো ক

* * *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ — কলিকাতা

নিঃসঙ্গ প্রবাসে যে সকল বন্ধু ও সহকর্ম্মীর
কথা সর্ব্বদাই স্মরণ করি
'অশোক' তাঁহাদিগকে
উপহার দিলাম।

সূচী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অশোক অথবা মৌর্য্যযুগ সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতে চাহেন এই ক্ষুদ্র পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে। বিদেশী ভাষায় লেখা বেশী দামের বই পড়িবার সুযোগ যাঁহাদের হয় না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই পুস্তিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। গল্প, উপাখ্যান ও কিংবদন্তীর দ্বারা পুস্তকের আকার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাই নাই ; পরন্তু ঐতিহাসিক প্রণালীতে অশোক অনুশাসন হইতে নির্ভরযোগ্য যে সকল সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই যথাসাধ্য সরলভাবে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই পুস্তক-সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ রায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; কিন্তু কোন প্রকার ভ্রম, প্রমাদ, দোষ, ক্রুটির জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। মানচিত্র অঙ্কনে শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন সাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সারনাথের সিংহচতুষ্টয় ও রামপুরবার বৃষের চিত্র ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী। ইতি

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫,
নয়া দিল্লী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

অশোকের ধর্ম্মলিপি
গুহালেখ. ⊙ ; গিরিলেখ. ▲
শিলালেখ × ; স্তম্ভলেখ. ⊥
শাবাজগড়ী
মানসেরা
সিন্ধু
চন্দ্রভাগা
ইরাবতী
শতদ্রু
তোপরা
কালসী
মীরাট
গঙ্গা
যমুনা
বৈরাট
নিগালীসাগর
রামপুররা
রুম্মিনদেঈ
লৌরিয়া-নন্দনগড়
লৌরিয়া-অররাজ
ব্রহ্মপুত্র
সারনাথ
কোসম
সাহসরাম
বরাবর
রূপনাথ
সাঁচী
নর্ম্মদা
তাপ্তী
গিরনার
মহানদী
ধৌলি
জৌগড়
সোপারা
গোদাবরী
কৃষ্ণা
মসকি
য়েরাগুড়ি
সিদ্দাপুর
পেন্নার
কাবেরী
লঙ্কা
বা
সিংহল
মাইল
০ ২০০ ৪০০

১
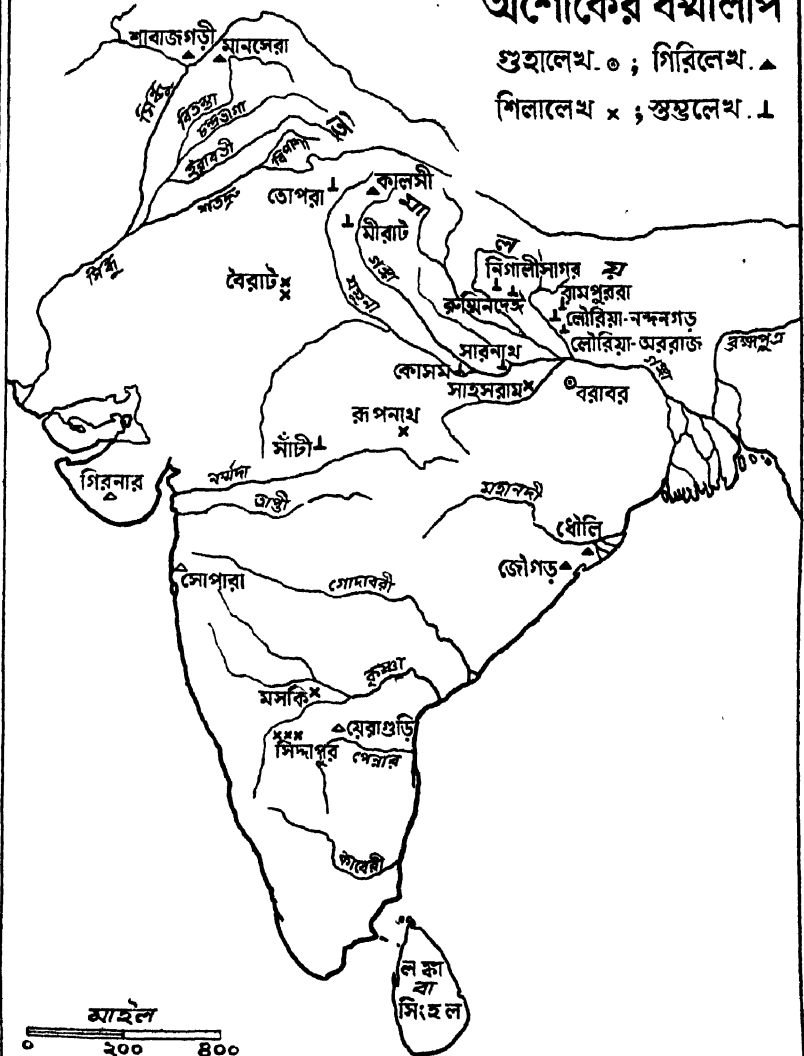
পাঠোদ্ধার

অনেক দিনের কথা। দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ শফরে বাহির হইয়াছিলেন। খিজিরাবাদের ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তোপরা গ্রাম। সেই গ্রামে সুলতানের ছাউনি পড়িয়াছিল। তোপরা পল্লীতে দেখিবার মত জিনিস ছিল একটি মস্ত বড় পাথরের লাট। লালচে রঙ্গের আস্ত একখানা বেলে পাথর চাঁছিয়া কুঁদিয়া পালিশ করিয়া কে জানে কোন অজানা কারিকর এই লাট তৈয়ারী করিয়াছিল। ফিরুজ শাহের সময়ের মিস্ত্রীরা পাথরে ওরকম পালিশ তুলিতে পারিত না। লাটটি লম্বায় ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি। সূর্য্যের কিরণ পড়িলে সোণার মত ঝক ঝক করিত। সুলতানের ইচ্ছা হইল এই অপূর্ব্ব জিনিসটি নিজের রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। কাজটা খুব সহজ হইল না। অত বড় লাট তুলিবার সময়েই জখম হইবার আশঙ্কা ছিল। আবার তোপরা গ্রাম হইতে দিল্লী পাকা নব্বই ক্রোশ। পথেও খুব সাবধান হইয়া চলা দরকার। সুলতানের লোকেরা রাশি রাশি শিমুল তুলা যোগাড় করিয়া আনিল। লাটের গোড়ায় সেই তুলা খুব পুরু করিয়া পাতিয়া তাহার উপর লাটটিকে আস্তে আস্তে কাত করিয়া ফেলা হইল। তার পরে ৪২ চাকার এক খানি মানুষ-টানা গাড়ীতে করিয়া সেই লাট আনা হইল যমুনার তীরে। সেখান হইতে নদী-পথে নৌকাযোগে এই বিরাট স্তম্ভ আসিয়া পৌঁছিল সুলতানের রাজধানীতে। ফিরুজ শাহ আপনার প্রাসাদ-শীর্ষে এই স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। এখনও দিল্লীতে ফিরুজ শাহের কোটলায় এই স্তম্ভটি দেখা যায়। প্রাসাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়, দেওয়াল

ভাঙ্গিয়াছে, গাঁথুনি খসিয়াছে, কিন্তু যে পালিশ দেখিয়া ফিরুজ শাহ মোহিত হইয়াছিলেন লাটের সেই পালিশ এখন পর্য্যন্ত একটুও মলিন হয় নাই।

এত অর্থব্যয়, এত পরিশ্রম করিয়া সুলতান নব্বই ক্রোশ দূর হইতে যে লাট লইয়া আসিলেন তখন কেহই তাহার পরিচয় জানিত না। সোণার মত ঝক ঝক করে, তাই সাধারণ লোকেরা ইহার নাম দিল সোণালী লাট ; অত বড় পাথরের স্তম্ভ, তাই কেহ কেহ ভাবিল নিশ্চয়ই মহাবীর ভীমসেনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে, তাহারা নাম দিল ভীমসেনের স্তম্ভ। আবার সুলতান ফিরুজ শাহ আনিয়াছিলেন বলিয়া দিল্লীর লোকেরা ফিরুজ শাহের লাট নামে ইহার পরিচয় দিত। লাটের গায়ে কি সব লেখা ছিল। কিন্তু সে অক্ষর তখন কেহ পড়িতে পারিত না। তাই ফিরুজ শাহের দরবারের পণ্ডিতেরা লাটের গায়ে কোন্ ভাষায় কি লেখা আছে বলিতে পারিলেন না। ফিরুজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন খৃষ্টীয় ১৩৫১ হইতে ১৩৮৮ সাল পর্য্যন্ত—৩৭ বৎসর। তাহার পরে দিল্লীতে কত সুলতান, কত বাদশাহ রাজত্ব করিলেন। কিন্তু লাটের লেখার রহস্য ভেদ হইল না। শেষে ১৮৩৭ সালে একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন।

ফিরুজ শাহের লাটের গায়ে যে-রকম অক্ষর লেখা দেখা যায় ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সেই রকম অক্ষরে লেখা আরও অনেক উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং পণ্ডিত-মহলে এই সকল লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছিল। জেম্‌স্ প্রিন্সেপ এই রকমের কতকগুলি ছোট ছোট উৎকীর্ণ লিপির প্রতিলিপি পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই লিপিগুলি পাওয়া গিয়াছিল সাঁচীর প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষের মধ্যে। এক এক লাইনের এক এক লিপি ; এগুলি কি কোন বড় শিলালিপির বিভিন্ন অংশ না এক একটি সম্পূর্ণ লিপি তাহাও জানা ছিল না। প্রিন্সেপ ধরিয়া

লইলেন যে সম্ভবতঃ এক এক লাইনেই এক একটি শিলালিপি সমাপ্ত হইয়াছে। তারপর তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে প্রত্যেকটি শিলালিপিরই শেষের দুইটি অক্ষর এক রকমের। এই দুইটি অক্ষরের পরিচয় পাইলে এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের একটা উপায় হইতে পারে। দুই অক্ষরে কিসের কথা লেখা যাইতে পারে, "দানের" না "মৃত্যুর"? অল্প কথায় আর কি বলা যায়? হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল ব্রহ্ম দেশের এক একটা বড় বৌদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ছোট ছোট চৈত্য নির্ম্মাণ করে, ধ্বজা স্থাপন করে, ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, আর ধ্বজায় ভক্ত দাতার নাম ও দানের কথা লেখা থাকে। এখানেও সেই রকম কিছু হওয়াই ত সম্ভব? তাহা হইলে, শেষের দুইটি অক্ষর হইতেছে "দ" ও "ন"-

এই ভাবে প্রাচীন লিপির দুইটি অক্ষরের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রিন্সেপ ভাবিলেন যে তাঁহার অনুমান ঠিক হইলে এই দুইটি অক্ষরের আগের অক্ষরটি হইবে সম্বন্ধসূচক "-স"। এই তিনটি অক্ষরের সাহায্যে তিনি ক্রমশঃ বাকী সকল অক্ষর, স্বরবর্ণের চিহ্ন, যুক্তাক্ষর, সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিলেন এবং সাঁচীর দানলিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইল। তখন তিনি দিল্লী-তোপরার স্তম্ভ-লিপিও পড়িলেন। দেখা গেল যে এই লিপির গোড়াতেই আছে "দেবানং পিয় পিয়দসি" (="দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী") নামক একজন অজানা রাজার উল্লেখ। গিরনার বা প্রাচীন রৈবতকের গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতেও
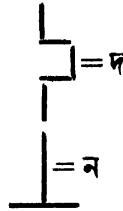
এই রাজার নাম পাওয়া গেল। আরও অনেক জায়গায় শৈলমূলে ও স্তম্ভগাত্রে প্রিয়দর্শী রাজার নামের উৎকীর্ণ-লিপি পাওয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে, প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ-লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইবার পর দেখা গেল যে গিরনারের গিরিলিপিতে যে চতুর্দ্দশটি অনুশাসন আছে অন্যান্য প্রদেশে আরও কয়েকটি গিরিলিপিতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ফিরুজ শাহের কোটলার প্রস্তর-স্তম্ভে যে সাতটি অনুশাসন আছে তাহার প্রথম ছয়টি অন্যত্র শিলা-স্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ভাষার সামান্য পার্থক্য থাকিলেও গিরিলিপি এবং স্তম্ভলিপিগুলির উদ্দেশ্য এক। এই সকল উৎকীর্ণ লিপিতে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার প্রজাবাৎসল্য ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশে মনুষ্য ও পশুচিকিৎসার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রজামাত্রের পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় তিনি তাহাদিগকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা এই সকল শিলালিপিতে এমন একজন রাজার সন্ধান পাইলেন যিনি দিগ্বিজয়ের অভিলাষ পরিহার করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, "বিহার-যাত্রা" পরিত্যাগ করিয়া "ধর্ম্ম-যাত্রা"য় রত হইয়াছিলেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি, সমস্ত জীবে যিনি সমদর্শী ছিলেন, সর্ব্বলোক-হিত যিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার "ধর্ম্মঘোষে" দুন্দুভি-নিনাদ স্তব্ধ হইয়াছিল। তখন সকলেই এই অসাধারণ রাজার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

২

প্রিয়দর্শীর পরিচয়

পুরাণে প্রিয়দর্শীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। রূপনাথ, সাহসরাম ও বৈরাটের গিরিলিপিতে প্রিয়দর্শীর নাম নাই। আছে কেবল “দেবানং পিয়”। অথচ অক্ষরের সাদৃশ্য, ভাষার সাদৃশ্য এবং বক্তার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে কোনই সন্দেহ থাকে না যে গিরনারের শিলালিপি ও দিল্লী-তোপরার স্তম্ভলিপি যে রাজার আদেশে লিখিত হইয়াছিল রূপনাথ, সাহসরাম ও বৈরাটের গিরিলিপিও তাঁহারই আদেশে লেখা হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রিয়দর্শীর পরিচয় বাহির করিবার জন্যও উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কাব্যে, পুরাণে যখন প্রিয়দর্শীর পরিচয় পাওয়া গেল না তখন তিনি সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের আশ্রয় লইলেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। সিংহলের ইতিহাস “দ্বীপবংশে” (পালি নাম “দীপবংস”) তিস্‌স নামক রাজাকে দেবানং পিয় তিস্‌স বলা হইয়াছে ; অতএব প্রিন্সেপ অনুমান করিলেন যে তিস্‌স ও পিয়দসি একই ব্যক্তি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে “দেবানং পিয় পিয়দসি” রাজার, অথবা কেবল মাত্র “দেবানং পিয়” বা শুধু “পিয়দসি” রাজার নামে যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে সিংহলরাজ দেবানং পিয় তিস্‌সেরই লিপি। কিন্তু প্রিন্সেপের এই অনুমান ঠিক হইল না।

কলিকাতা-বৈরাট শিলা-লিপির প্রারম্ভেই প্রিয়দর্শী রাজা আপনাকে “মাগধ” (পিয়দসি লাজা মাগধে সংঘং অভিবাদেতূণং

আহা=মাগধ রাজা প্রিয়দর্শী সংঘকে অভিবাদন করিয়া বলিতেছেন) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিস্‌স মগধের রাজা ছিলেন না। গিরনার গিরিলিপির পঞ্চম অনুশাসনের শেষ অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায় পাটলিপুত্র নগর দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রাজধানী ছিল। আবার মৌর্য্য রাজা অশোকের পৌত্র দশরথ নাগার্জ্জুনী পাহাড়ের গুহালিপিতে নিজের নামের সহিত দেবানাং প্রিয় উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। সিংহল-প্রবাসী পণ্ডিত টার্ণার (Turnour) দেখাইলেন যে দ্বীপবংশে সম্রাট অশোককে বহু স্থানে প্রিয়দর্শী বা প্রিয়দর্শন বলা হইয়াছে। সুতরাং গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপির প্রিয়দর্শী রাজা অশোক ব্যতীত অপর কেহ নহেন। প্রিন্সেপও পরিশেষে এই মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করিতেন যে অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তও "প্রিয়দর্শী" হইতে পারেন, কারণ মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তের "প্রিয়দর্শন" নাম পাওয়া যায়। গিরিলিপিতে প্রিয়দর্শীর সমসাময়িক পাঁচ জন 'যবন' রাজার নাম আছে। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদের সময়ে জীবিত ছিলেন না। সুতরাং এই মতও পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত হয় নাই। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত রায়চুর জেলার মস্‌কি গ্রামের অদূরে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পর এ বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান হইয়াছে। এই লিপির প্রারম্ভে "দেবানং পিয়স অসোকস" অর্থাৎ "দেবানাং প্রিয়স্য অশোকস্য" পদ পাওয়া গিয়াছে। মস্‌কি-লিপি অসম্পূর্ণ হইলেও সাহসরামের গিরিলিপির সহিত ইহার ভাষার ঐক্য আছে। সুতরাং দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী এবং দেবানাং প্রিয় অশোক যে একই ব্যক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য "দেবানাং প্রিয়" একটি উপাধি, কাহারও নাম নহে। প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ-লিপিতে কোথাও কোথাও "দেবানাং পিয়ের" প্রতিশব্দ হিসাবে "রাজা" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।
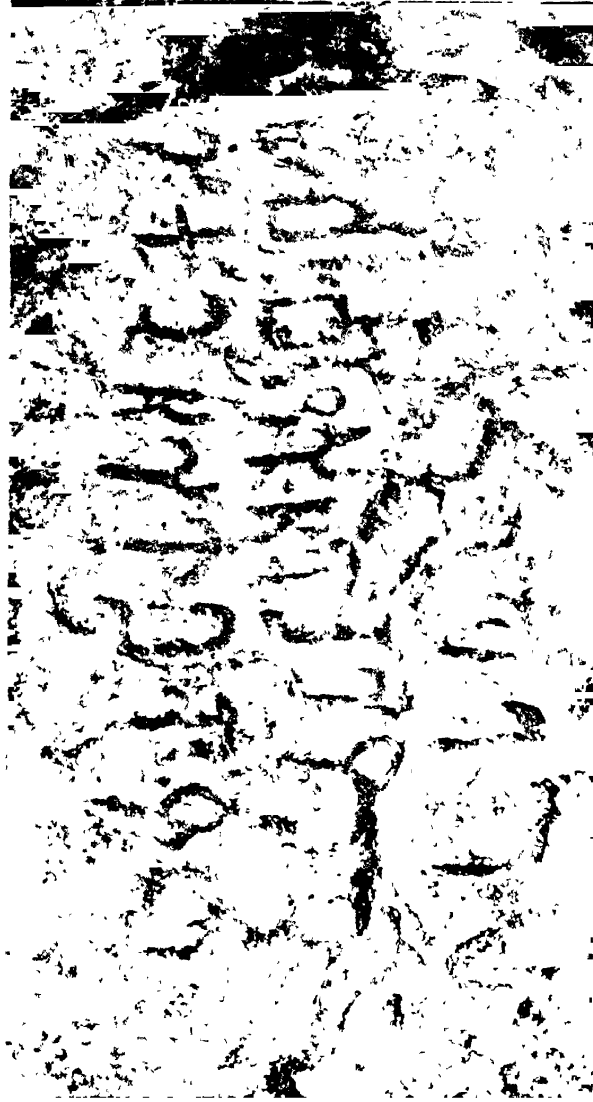
মস্‌কি লিপির তিন ছত্র

দেবানং পিয়স অসোকস্‌

প্রিয়দর্শী অশোক সম্বন্ধে পুরাণ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনেক অবদান ও আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকা ইতিহাস নহে। অশোকের রাজত্বের নির্ভরযোগ্য বিবরণ এবং তাঁহার জীবনের আদর্শ ও কার্য্যাবলীর পরিচয় তাঁহার উৎকীর্ণ-লিপিগুলিতেই পাওয়া যায়। অতএব এখানে অশোকের গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সংস্থান-স্থলের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

৩

অশোকের ধর্ম্ম-লিপি

একালের পণ্ডিতেরা আলোচনার সুবিধার জন্য প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ-লিপিগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। অশোকের অনুশাসনগুলি পর্ব্বত-গাত্রে, শিলাফলকে, গিরি-গুহায় অথবা শিলা-স্তম্ভে উৎকীর্ণ। গিরি-লিপি ও স্তম্ভলিপি-গুলিকে অশোক স্বয়ং "ধর্ম্মলিপি" নাম দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুইটি, যুক্ত প্রদেশের একটি এবং কাথিয়াবাড়ের একটি গিরি-লিপিতে চতুর্দ্দশটি করিয়া অনুশাসন আছে। উৎকলে আবিষ্কৃত অশোকের দুইটি গিরি-লিপিতে এই চৌদ্দটি অনুশাসনের মধ্যে মাত্র এগারটি আছে এবং উপরন্তু নূতন দুইটি অনুশাসন সন্নিবেশিত হইয়াছে। বোম্বাইর নিকট অষ্টম অনুশাসন সম্বলিত একটি ভগ্ন শিলাখণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ গণনার মধ্যে না আসিলেও অনুমান করা যাইতে পারে যে এখানেও পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটি অনুশাসন খোদিত হইয়াছিল। এই চতুর্দ্দশ অনুশাসনের উৎকীর্ণ-লিপিগুলি আকারে অশোকের অন্যান্য ধর্ম্ম-লিপি অপেক্ষা বড়। এই ছয়টি স্থানের লিপিগুলি ইংরাজীতে Rock Edicts নামে পরিচিত। আমরা সুবিধার জন্য এই গুলিকে গিরিলেখমালা বলিব, এবং অন্যান্য গিরি-লিপিকে শৈললেখমালা (Minor Rock Edicts) বলিয়া উল্লেখ করিব। স্তম্ভলিপিগুলিও এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ছয়টি স্তম্ভে দিল্লী-তোপরার ছয়টি অনুশাসন লিপি পাওয়া যায়। এই স্তম্ভলিপিগুলিকে স্তম্ভলেখমালা এবং অন্যান্য স্তম্ভলিপিকে লাটলেখমালা বলা যাইবে।

অ আ ই উ এ ও

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড,ড় ঢ,ঢ় ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য,য র ল

র শ ষ স হ ল ং

কা কি কী কু কূ কে কো কং

ক্য ক্ল ক্র থ্য ঞে ঞো টা ডড ধ্য

প্র গু,(স্ব)ষ্ঠ র্ব(ত্র) ব্য ব্য(য্ব)স্ত স্ট স্ম ভ্য

অশোক লিপি।

(শ্রীযুক্ত চারু বসু ও শ্রীযুক্ত ললিত কর মহাশয়ের "অশোক" হইতে গৃহীত ও সামান্য সংশোধিত)

দিল্লী-তোপরার স্তম্ভলিপি যে অক্ষরে লেখা হইয়াছে তাহাকে ব্রাহ্মী অক্ষর বলে। এই ব্রাহ্মী অক্ষর হইতেই আধুনিক দেবনাগরী, বাঙ্গলা, গুজরাটী ও ওড়িয়া বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রাপ্ত দুইটি গিরিলিপি ব্যতীত অশোকের আর সমস্ত উৎকীর্ণ-লিপিই ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দুই স্থানে অশোকের গিরিলিপিমালা পাওয়া গিয়াছে। এই দুই স্থানেই অন্য এক রকমের অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়। এই অক্ষরকে খরোষ্ঠী বা খরোষ্ট্রী বলে। ব্রাহ্মী অক্ষর বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লেখা হয়। খরোষ্ঠী আধুনিক ফার্সী ও আরবী বর্ণমালার ন্যায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত হইত। প্রিন্সেপ, ল্যাসেন, নরিস্ ও কানিংহাম এই পণ্ডিত-চতুষ্টয়ের চেষ্টায় খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত অশোকের ধর্ম্মলিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইয়াছিল। ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার কালে প্রিন্সেপ সাহেবকে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার কার্য্যে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রার সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও আধুনিক পঞ্জাবে এক সময় শক ও যবন (গ্রীক) রাজাদিগের আধিপত্য ছিল। যবন ও শক রাজাদিগের মুদ্রায় দুই রকমের বর্ণমালার ব্যবহার দেখা যায়। ভারতীয় যবন রাজাদিগের মুদ্রায় গ্রীক ও খরোষ্ঠী উভয় অক্ষরেই রাজার নাম লেখা হইত। সুতরাং গ্রীক ভাষার সাহায্যে গুটি কয়েক খরোষ্ঠী অক্ষর পড়া গিয়াছিল এবং ক্রমশঃ পরিচিত অক্ষরের সাহায্যে অপরিচিত অক্ষরগুলির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

পেশোয়ার হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে শাবাজগড়ী গ্রাম। এই গ্রামের অদূরে পর্ব্বতগাত্রে খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ চতুর্দ্দশ অনুশাসন মালার ধর্ম্মলিপি আছে। ১৮৩৬ সালে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সেনাপতি কোর্ট্ শাবাজগড়ীর গিরি-লেখমালার কথা

পণ্ডিতসমাজের গোচর করেন। দুই বৎসর পরে কাপ্তেন বার্ণ্সের চেষ্টায় ইহার ছাপ লওয়া হইয়াছিল। ঐ বৎসরই ম্যাসন্ সাহেবও শাবাজগড়ীর অনুশাসনমালার প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত গিরিলেখমালার দ্বিতীয় প্রস্থ পাওয়া গিয়াছে সীমান্ত প্রদেশের এবটাবাদ সহর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে মানসেরা গ্রামে। গ্রামের উত্তর দিকে তিনটি পাথরের চাঙ্গড়ের উপর অনুশাসনগুলি খোদা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে অশোকের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খরোষ্ঠী বর্ণমালার ব্যবহার ছিল বলিয়াই তিনি শাবাজগড়ী ও মানসেরার অনুশাসনমালা ঐ অক্ষরে লেখাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ লোকেরা বোধ হয় খরোষ্ঠী পড়িতে পারিত না, তাই তাহাদের সুবিধার জন্য আর সকল জায়গায় ব্রাহ্মী অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে। কালের প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টিতে উৎকীর্ণ-লিপিগুলির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কোথাও কোথাও পাথর ক্ষয় হওয়ায় অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন জায়গায় পাথর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং চতুর্দ্দশ অনুশাসনমালার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ পাঠ প্রস্তুত করিতে হইলে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত ছয়টি গিরিলেখই মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফরেষ্ট্ সাহেব যুক্ত প্রদেশের দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কাল্সী গ্রামের অদূরে যমুনার পশ্চিম তীরে একটা প্রকাণ্ড কোয়ার্টজ পাথরের চাঙ্গড়ে অশোকের আর একটি গিরিলেখ আবিষ্কার করেন। কাল্সী গ্রাম মুসুরী হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে। এই লেখটির দক্ষিণ দিকে একটি হাতীর রেখা-চিত্র আছে। "গজতমে" বা গজশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই হাতীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

গিরিলেখমালার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় গিরনার লিপি। ১৮২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেজর (পরে কর্ণেল) জেমস্ টড জুনাগড় হইতে এক মাইল পূর্ব্বে গিরনার

গিরিগাত্রে প্রায় ১০০ বর্গফুটব্যাপী এক বিরাট উৎকীর্ণ-লিপি দেখিতে পান। তখনও প্রিন্সেপ অশোকলিপির পাঠোদ্ধার করেন নাই, সুতরাং টডও তাঁহার আবিষ্কৃত গিরিলেখের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। পরে জানা গিয়াছিল যে গিরনার লিপিতেও প্রিয়দর্শীর চতুর্দ্দশ অনুশাসনই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৮২২ সালে গিরনারের গিরিলেখ অক্ষত ছিল, কিন্তু পরে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য পথ-নির্ম্মাণ-কালে বারুদ সহযোগে পাথর ভাঙ্গিয়া পঞ্চম ও ত্রয়োদশ অনুশাসনের কিয়দংশ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ-লিপি-সম্বলিত দুই খানি ভাঙ্গা পাথর পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ত্রয়োদশ অনুশাসনের নষ্টাবশেষের কিছু কিছু আছে। এই পাথর দুইখানি এখন জুনাগড়ের যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। গিরনার গিরিলিপিতে প্রত্যেকটি অনুশাসন সরল রেখা টানিয়া পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। অশোকের অনুশাসন ব্যতীত গিরনার পাহাড়ে আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য উৎকীর্ণ-লিপি আছে। প্রথমটিতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কর্ম্মচারী (রাষ্ট্রীয়) পুষ্যগুপ্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুদর্শন নামক জলাশয়ের সংস্কারের কথা লিখিয়াছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যবন রাজা তুষাস্প এই জলাশয়ে পয়ঃপ্রণালী যোগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উৎকীর্ণ-লিপি গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের সময়ের। তাঁহার কর্ম্মচারী সুরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা পর্ণদত্ত-তনয় চক্রপালিত আবার সুদর্শন জলাশয়ের সংস্কার করিয়াছিলেন।

বোম্বাই প্রদেশের ঠানা জিলার অন্তর্গত সোপারা প্রাচীন কালে এক সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তখন ইহার নাম ছিল সূর্পারক। এক সময়ে এখানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। দেশ-বিদেশের বহু বণিক ব্যবসায় উপলক্ষে সূর্পারকে যাতায়াত করিত। এইখানে ১৮৮২ সালে পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী উৎকীর্ণ-লিপি-সম্বলিত একটি শিলাখণ্ড আবিষ্কার করেন। ইহাতে

গিরিলেখমালার অষ্টম অনুশাসনের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ আছে। এই পাথরখানি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

গিরিলেখমালার বাকী দুইটি পাওয়া গিয়াছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে উড়িষ্যায়। অশোকের সময়ে এই প্রদেশের নাম ছিল কলিঙ্গ। ভুবনেশ্বরের সাত মাইল দক্ষিণে ধৌলি গ্রামে ১৮৩৭ সালে লেপ্টেনান্ট কিটো একটি গিরিলেখ আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের গায়ে প্রায় ১৫০ বর্গফুট পরিমিত স্থান চাঁছিয়া পালিশ করিয়া তাহার উপর অনুশাসনগুলি গভীরভাবে খোদা হইয়াছিল। কাল্‌সী লিপির পাশে একটি হাতীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে। ধৌলি লিপির উপরিভাগে পাহাড় কাটিয়া একটি হস্তিদেহের সম্মুখের ভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। গঞ্জাম জিলার গঞ্জাম সহরের ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জৌগড় নামক একটি প্রাচীন দুর্গের জীর্ণাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে ঋষিকুল্য নদীর তীরে উড়িষ্যার দ্বিতীয় গিরিলেখ পাওয়া গিয়াছে। ধৌলি ও জৌগড় লিপির একটু বিশেষত্ব আছে। এই দুইটি লিপিতে শাবাজগড়ী, মানসেরা, কাল্‌সী ও গিরনারের গিরিলেখমালার একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অনুশাসন নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আছে দুইটি অতিরিক্ত অনুশাসন। অশোক তাঁহার চতুর্দ্দশ অনুশাসনে বলিয়াছেন যে স্থান-ভেদে অথবা লিপিকরের ত্রুটিতে কোথাও কোথাও তাহার ধর্ম্মলিপি সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। লিপিকরের ত্রুটিতে ধৌলি ও জৌগড় লিপিতে তিনটি অনুশাসন পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ত্রয়োদশ অনুশাসনে কলিঙ্গবিজয় ও তজ্জনিত অসংখ্য লোকক্ষয়ের কথা আছে। কলিঙ্গ দেশের গিরিলেখমালায় অশোক বোধ হয় সেই অপ্রীতিকর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা সমীচীন বিবেচনা করেন নাই।

শৈললেখমালা এ পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আটটি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক মধ্যপ্রদেশের শ্লীমানাবাদ ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে রূপনাথ পাহাড়। এখানে রূপনাথ শিবের মন্দির আছে। প্রত্যেক বৎসর মেলা উপলক্ষে রূপনাথে বহু লোকের ভিড় হয়। বোধ হয় প্রাচীন কালেও এই শিবতীর্থে বহু যাত্রীর সমাগম হইত এবং তাহাদেরই অবগতির জন্য এই শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন শৈলগাত্রে দেবতাদিগের প্রিয় অশোক ছয় ছত্রে আপনার ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মনীতির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ বিহারের শাহাবাদ জিলার সাহসরাম সহরের দুই মাইল পূর্ব্বে চন্দনপীর পাহাড়ের একটি গুহায় রূপনাথ-লিপির অনুরূপ আর একটি শৈললেখ আছে। জয়পুর রাজ্যের বৈরাট গ্রামের অদূরে দুইটি শৈললেখ পাওয়া গিয়াছে। বৈরাট হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে "ভীম কি ডুঙ্গরী" নামক পাহাড়ে যে অশোকলিপি আছে তাহা রূপনাথ ও সাহসরাম লিপিরই পুনরাবৃত্তি। এই লিপিটির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈরাটের প্রথম লিপি আবিষ্কৃত হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪০ সালে কাপ্তেন বার্ট ঐ গ্রামের নিকটেই ২′×২′×১ পরিমিত একটি গ্রেণাইট পাথরের টুকরায় খোদিত আর একটি অশোক-লিপি আবিষ্কার করেন। এই শৈললেখ এখন কলিকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির হেপাজতে আছে। এক সময় বৈরাট হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাবরু গ্রামের নামানুসারে এই লেখটি "ভাবরা" বা "ভাবরু" লিপি বলিয়া অভিহিত হইত। হুল্টশ্ সাহেব তাহার গ্রন্থে এই শিলালিপির নাম দিয়াছেন "কলিকাতা-বৈরাট শৈললেখ"। কলিকাতা-বৈরাট লিপিতেই প্রিয়দর্শী "মাগধ" বা মগধ-দেশীয় রাজা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কোন কোন সূত্র বা সূত্রাংশের প্রতি প্রিয়দর্শীর

বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এই লিপিতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। মস্‌কি লিপির কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে সি, বীডন নামক একজন এঞ্জিনীয়ার এই শৈললেখ আবিষ্কার করেন। পরলোকগত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। তিনি বলেন যে চালুক্য ও যাদব রাজাদিগের উৎকীর্ণ-লিপিতে মস্‌কি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। ১৮৯২ সালে মিঃ বি, এল, রাইস মহীশূর রাজ্যের ব্রহ্মগিরি, সিদ্দাপুর এবং জটিঙ্গ রামেশ্বর পাহাড়ে আরও তিনটি শৈললেখ আবিষ্কার করেন। এই লেখ তিনটিতে রূপনাথ, সাহসরাম, বৈরাট ও মস্‌কির অনুশাসন ব্যতীত আরও একটি অনুশাসন আছে। এই তিনটি শৈললেখের লিপিকরের নাম "চপড়"। চপড় কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখতিনটির মধ্যে ব্রহ্মগিরি-লিপির অবস্থাই ভাল। ব্রহ্মগিরি-লিপি তের ছত্রে, এবং সিদ্দাপুর-লিপি ২২ ছত্রে লেখা হইয়াছে, জটিঙ্গ রামেশ্বর লিপিতে কম পক্ষে ২৮ ছত্র লেখা আছে।

এতদ্ব্যতীত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কুর্ণুল জিলার অন্তর্গত গুত্তি সহর হইতে ৮ মাইল দূরে য়েরাগুড়ি গ্রামের অদূরে য়েনকোণ্ড বা গজগিরিতে একই জায়গায় চতুর্দ্দশ গিরিলেখমালা এবং শৈললেখমালা পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সালে বাঙ্গালী খনিতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অনু ঘোষ মহাশয় এই অঞ্চলে ভ্রমণকালে ছয়টি পাথরের চাঙ্গড়ের উপর এই উৎকীর্ণ লিপিগুলি দেখিতে পান এবং ইহার প্রতি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঘোষ মহাশয় স্বয়ং "দেবানং" এবং "পিয়দসি" এই দুইটি শব্দ পাঠ করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং য়েনকোণ্ডের উৎকীর্ণ লিপিগুলি যে অশোকের অনুশাসন সে বিষয়ে প্রথম অবধি কোনই সন্দেহ ছিল না। য়েরাগুড়ি লিপির বিশেষত্ব এই যে এখানকার মত অন্য কোথাও একই জায়গায় গিরিলেখমালা ও শৈললেখমালা পাওয়া যায় নাই। এখানকার

শৈললেখমালা মহীশূরে প্রাপ্ত তিনটি শৈললেখমালার অনুরূপ হইলেও প্রথমে ইহার পাঠোদ্ধার করা যায় নাই। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া এবং শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র লক্ষ্য করেন যে য়েরাগুড়ি-লিপির এই অংশ ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা হইলেও ইহার প্রত্যেক পংক্তির এক অর্দ্ধেক দক্ষিণ হইতে বামে এবং অপরার্দ্ধ বাম হইতে দক্ষিণে লেখা। ব্রাহ্মী অক্ষরে সাধারণতঃ বাম হইতে দক্ষিণে লিখিবার নিয়ম। ইহার পূর্ব্বে কেবল একটি মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপিতে দক্ষিণ হইতে বামে লেখা রাজার নাম পাওয়া গিয়াছিল। য়েরাগুড়ি-লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে ব্রাহ্মী অক্ষরেও কখন কখনও দক্ষিণ হইতে বামে লেখা হইত। শ্রীযুত ঘোষ মহাশয় মনে করেন যে অশোক-অনুশাসনের নিকটেই কোথাও হয়ত হাতীর প্রস্তর মূর্ত্তি অথবা রেখা চিহ্ন ছিল, সেই জন্য পাহাড়টির নাম হইয়াছে য়েনকোণ্ড অথবা গজগিরি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ওখানে হাতীর মূর্ত্তি অথবা ছবি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই অনুমান ঠিক কিনা বলা যায় না।

গয়ার ১৫ মাইল উত্তরে বরাবর-গিরিতে রাজা প্রিয়দর্শী আজীবিকদিগকে তিনটি গুহা দান করিয়াছিলেন। গুহা তিনটির মধ্যে যে দানলিপি আছে তাহাতে দাতা কেবল রাজা প্রিয়দর্শী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে তিনি আজীবিক সন্ন্যাসীদিগকে দুইটি গুহা দিয়াছিলেন, তৃতীয় গুহা দান করিয়াছিলেন অভিষেকের একোনবিংশতি বৎসরে। নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে অশোকের পৌত্র দেবানাং প্রিয় দশরথও আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুদিগের বাসের জন্য তিনটি গুহা দান করিয়াছিলেন।

দিল্লী-তোপরার অশোকস্তম্ভের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্তম্ভটিতে অশোকের সাতটি অনুশাসন আছে। সুলতান ফিরুজ শাহ মীরাট হইতেও একটি অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে লইয়া আসিয়াছিলেন

এবং কুশ্‌ক্‌-ই-শিকার বা মৃগয়াবাসের অদূরে পাহাড়ের উপরে এই স্তম্ভটি স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লী-মীরাট স্তম্ভলিপিতে দিল্লী-তোপরার সাতটি অনুশাসনের প্রথম ছয়টির সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া পাঁচ-টুকরা হইয়া গিয়াছিল; এখন আবার ভাঙ্গা টুকরাগুলি জুড়িয়া আগের জায়গায় খাড়া করা হইয়াছে। বিহারের চম্পারণ জিলায় তিনটি অশোকস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটির সংস্থান-স্থল কেসরিয়ার বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লৌরিয়া গ্রামে, দ্বিতীয়টির সংস্থান-স্থল বেতিয়া হইতে ১৫ মাইল দূরে আর এক লৌরিয়া গ্রামে। স্থানীয় লোকের ধারণা যে এই দুইটি লাটই শিবলিঙ্গ এবং সেই জন্য দুই গ্রামের লৌরিয়া নাম হইয়াছে। যাহা হউক, দুই গ্রামেরই এক নাম হওয়াতে স্তম্ভের পরিচয়ের গোলমাল হইতে পারে, এই জন্য দুই লৌরিয়ার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি গ্রামের নাম যোগ করা হইয়াছে। প্রথম স্তম্ভটি এখন লৌরিয়া-অররাজের স্তম্ভ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টিকে লৌরিয়া-নন্দনগড়ের স্তম্ভ বলা হয়। নন্দনগড়ের পার্শ্ববর্ত্তী লৌরিয়ার অধিবাসীদিগের বিশ্বাস যে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন তাহাদের গ্রামে এই বিরাট শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। দুইটি স্তম্ভেই দিল্লী-তোপরার ছয়টি অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। পরলোকগত পণ্ডিত ভিনসেন্ট্‌ স্মিথ্‌ বলেন যে লৌরিয়া-অররাজ-স্তম্ভের শীর্ষে একটি গরুড়-মূর্ত্তি ছিল। লৌরিয়া-নন্দনগড়ের স্তম্ভের মাথায় উত্তরাস্য একটি সিংহমূর্ত্তি আছে; চম্পারণ জিলার তৃতীয় অশোকস্তম্ভ বেতিয়া হইতে ৩২½ মাইল উত্তরে রামপুরবা গ্রামে অবস্থিত। এই স্তম্ভেও দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলেখের ছয়টি অনুশাসন রহিয়াছে। স্তম্ভটি অনেক দিন হইল পড়িয়া গিয়াছে। স্তম্ভের মাথার সিংহমূর্ত্তিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এলাহাবাদের দুর্গের ভিতর আর একটি অশোক-স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভে দিল্লী-তোপরার ছয়টি অনুশাসন ব্যতীত "রাণীর

অনুশাসন" এবং কৌশাম্বী অনুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে এই স্তম্ভের গাত্রেই আবার মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী-সম্বলিত প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরও এইখানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম লিখাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লাটের গায়ে কতকগুলি নাগরী লেখাও দেখা যায়। এলাহাবাদ-স্তম্ভে একটি লিপিতে দেবানাং প্রিয় কৌশাম্বীর মহামাত্রদিগকে আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে পূর্ব্বে এই স্তম্ভ কৌশাম্বীতেই (এলাহাবাদ হইতে ২৮ মাইল দূরে যমুনার বাম তীরে বর্ত্তমান কোসম গ্রামে) স্থাপিত হইয়াছিল, পরে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সুলতান ফিরুজ শাহই এই স্তম্ভটি কোসম হইতে এলাহাবাদে আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না হইতেও পারে, কারণ ফিরুজ শাহ স্তম্ভটি পাইলে তোপরা ও মীরাটের স্তম্ভের মত আপনার রাজধানী দিল্লীতেই লইয়া যাইতেন। স্তম্ভগাত্রে যখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের লিপি পাওয়া যাইতেছে তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে ঐ বৎসরের পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ বাদশাহ আকবরের রাজত্ব কালে কোসম স্তম্ভ এলাহাবাদে আসিয়াছিল। এখন এই স্তম্ভটি "এলাহাবাদ-কোসম স্তম্ভ" নামে পরিচিত। ১৮০৪ সালে কর্ণেল কিড্ স্তম্ভটিকে মাটিতে নামাইয়া রাখেন। ১৮৩৪ সালে প্রিন্সেপ সাহেবের অনুরোধে লেফ্টেনাণ্ট বার্ট্ এই স্তম্ভের একটি সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে স্থানীয় লোকেরা এই শিলাস্তম্ভটিকে মহাভারতের মহাবীর ভীমের গদা বলিয়া মনে করিত। ১৮৩৮ সালে কাপ্তেন এডোয়ার্ড্ স্মিথের তত্ত্বাবধানে এলাহাবাদ-কোসম লাট আবার স্থাপিত হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পূর্ব্বেই স্তম্ভের মাথার সিংহমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ১৮৩৮ সালে স্মিথ্ সাহেবের পরিকল্পিত একটি

সিংহ স্তম্ভের মাথায় বসান হইয়াছে। কানিংহামের মতে এই সিংহটি একেবারেই বেমানান্ হইয়াছে।

এই ছয়টি স্তম্ভ ব্যতীত এযাবৎ অশোকলিপি-সম্বলিত আরও চারিটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। মধ্যভারতের সাঁচীতে প্রাচীনকালে বিরাট বৌদ্ধস্তূপ ছিল। এই স্তূপের সম্মুখেই অশোক একটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্তম্ভ-শীর্ষে চারিটি সিংহ ছিল। স্তম্ভের অদূরে সিংহ-চতুষ্টয়ের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বোধি-লাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীর অদূরে সারনাথে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। এখানেও একটি অশোক-স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ-শীর্ষে চারিটি সিংহ পিঠাপিঠি দাঁড়াইয়া আছে। সিংহচতুষ্টয়ের মধ্যে এক সময়ে একটি ধর্ম্মচক্র ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চীনদেশের পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং সারনাথে "অশোকরাজ"-নির্ম্মিত একটি স্তূপ ও তাহার প্রাঙ্গণে ৭০ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান স্তম্ভের উচ্চতা ৩৭ ফুটের বেশী নহে। হয় য়ুয়ান চোয়াং স্তম্ভের উচ্চতা সঠিক অনুমান করিতে পারেন নাই, না হয় তিনি যে স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাঁচী ও সারনাথের লাট-লেখমালায় সঙ্ঘের শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের শাস্তির বিধান আছে। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ ফুরার্ নেপালের তরাই জঙ্গলে রুম্মিন্দেঈ মন্দিরের নিকট একটি অশোকস্তম্ভ আবিষ্কার করেন। রুম্মিন্দেঈর লাট-লেখ হইতে জানা যায় যে এইখানেই ভগবান্ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিষেকের বিংশতি বর্ষে অশোক লুম্বিনী-গ্রামে আসিয়া স্তম্ভস্থাপন করেন। য়ুয়ান চোয়াং বলেন যে এই স্তম্ভশীর্ষে একটি প্রস্তরের অশ্বমূর্ত্তি ছিল। স্তম্ভের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অশ্বমূর্ত্তির চিহ্নমাত্রও এখন অবশিষ্ট নাই। বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রুম্মিন্দেঈর যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে
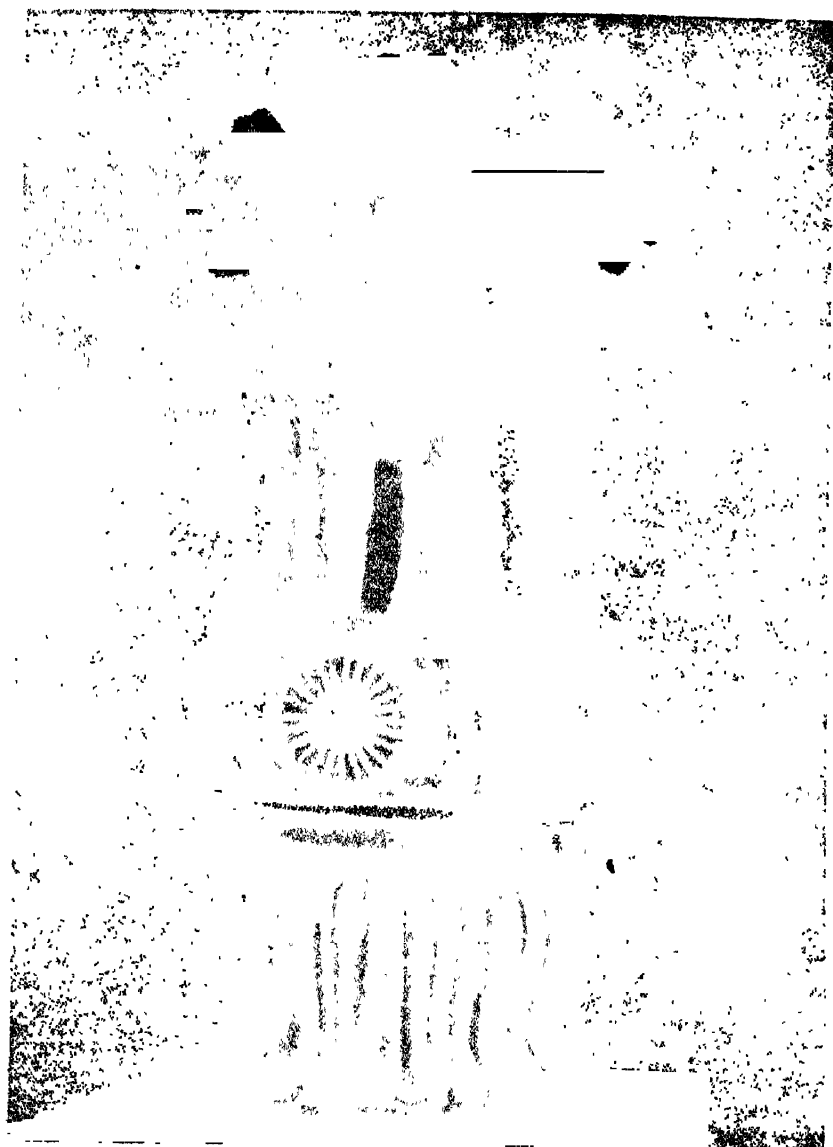
সারনাথের অশোক-স্তম্ভের শিরোভাগ

দেখা যায় যে স্থানীয় মন্দিরের অভ্যন্তরে বুদ্ধের জন্মের চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে। ১৮৯৫ সালে তরাইর জঙ্গলে নিগালী-সাগর নামক জলাশয়ের তীরে ডাঃ ফুরার্ আর একটি অশোক-স্তম্ভ দেখিতে পাইয়াছিলেন। স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ইহার দুই টুকরার বেশী পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় লোকের মতে নিগালীসাগর-স্তম্ভ ভীমসেনের হুঁকা। এখানকার লাট-লেখের মর্ম্ম এই যে এখানে অশোক তাঁহার অভিষেকের চতুর্দ্দশ বৎসরে কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপের আয়তন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং অভিষেকের [বিংশতি ?] বৎসরে স্বয়ং আসিয়া পূজা করিয়াছিলেন ও স্তম্ভস্থাপন করিয়াছিলেন। য়ুয়ান চোয়াং এই স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে কনকমুনি বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর রচিত স্তূপের প্রাঙ্গণে এই স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং স্তম্ভশীর্ষে একটি সিংহমূর্ত্তি ছিল। নিগালীসাগর-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ যেখানে পাওয়া গিয়াছে তাহার নিকটে য়ুয়ান চোয়াং-এর কথিত স্তূপের সন্ধান এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

অশোকের সমস্ত স্তম্ভ ও গিরিলিপি এখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। য়ুয়ান চোয়াং যে ১৬টি অশোক-স্তম্ভের কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে দুইটির বেশী এখনও সনাক্ত করা যায় নাই। হয়ত ভবিষ্যতে আরও অশোক-স্তম্ভ ও অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ যাবৎ আমাদের বাঙ্গালা দেশের সীমানার ভিতরে একখানি অশোক-লিপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বৎসর ১১ই ডিসেম্বরের খবরের কাগজে প্রকাশ বিন্ধ্যপ্রদেশের দতিয়া রাজ্যের গুজররা গ্রামে অশোকের আর একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই উৎকীর্ণ লিপিতে রাজার নাম দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোকের ২৫৬ দিন ব্যাপী ভ্রমণের কথা এই লিপিতে আছে। মস্‌কি লিপিতে অশোকের নাম আছে, প্রিয়দর্শী নাই। এক জায়গায় প্রিয়দর্শী ও অশোক নাম এই প্রথম পাওয়া গেল।

হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষায় লেখা। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রথমে পালিভাষায় লেখা হইত, পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন। অশোকের ধর্ম্মলিপি সংস্কৃত অথবা পালিভাষায় লেখা হয় নাই, লেখা হইয়াছে প্রাকৃতে। বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্মলিপির ভাষার মধ্যেও অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়; যথা, গিরনারের প্রথম অনুশাসনে ময়ুর-বাচক "মোরা" শব্দ পাই। কাল্সীতে ইহার পরিবর্ত্তে "মজুল" এবং শাবাজগড়ী ও মানসেরাতে "মজুর" পাঠ আছে। গিরনার, কাল্সী, ধৌলি ও জৌগড়ের "ধংমলিপি"র পরিবর্ত্তে শাবাজগড়ী ও মানসেরায় "ধ্রমদিপি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। আবার গিরনারের "রাঞো"র স্থানে কাল্সী ও জৌগড়ে "লাজিনে" এবং মানসেরায় "রজিনে" পাঠ পাওয়া যায়। তবে কি অশোক বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্ম্মলিপিতে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন? সে ভাষা কি সাধু ভাষা না প্রাদেশিক কথ্য ভাষা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বহুজনের হিতের জন্য অশোক যে ধর্ম্মলিপি লেখাইয়াছিলেন তাহার ভাষাও সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারিত। তাঁহার ধর্ম্মলিপিগুলি সারনাথ, লুম্বিনী, নিগালীসাগর, গিরনার ও রূপনাথের মত তীর্থস্থানে পাওয়া গিয়াছে; মান্সেরা সেকালের একটি প্রধান তীর্থের পথে অবস্থিত; সূর্পারক বা সোপারা সেকালের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে অশোকের ধর্ম্মলিপি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে সাধারণ তীর্থযাত্রী বা হাটবাজারের লোকের কোনই অসুবিধা হইত না।

৪

ইতিহাস

উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে অশোকের বংশপরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কাল্‌সী, শাবাজগড়ী ও মানসেরা গিরিলেখের অষ্টম অনুশাসনে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "দেবানাং প্রিয়"-দিগের বিহার-যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নাম বলেন নাই। পরিজনদিগের মধ্যে এলাহাবাদ-কোসম স্তম্ভ-লেখমালায় "রাণীর অনুশাসনে" দ্বিতীয়া রাণী "কালুবাকী" (চারুবাকী) ও তাঁহার পুত্র "তীবলের" (তীবর) নাম আছে। গিরি-লেখের পঞ্চম অনুশাসন হইতে অনুমান হয় যে তাঁহার একাধিক পুত্র ও পৌত্র ছিল। "দহীলথ" (দশরথ)-নামক এক রাজা গয়ার নিকট নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে আজীবিকদিগের বাসের নিমিত্ত তিনটি গুহা দান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ইনি অশোকের পৌত্র। উৎকীর্ণ লিপিতে অশোকের ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের অবরোধনের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতা ও পিতামহের কথা জানিতে হইলে সমসাময়িক যবন (গ্রীক) পণ্ডিতদিগের লিখিত বিবরণ ও পুরাণ পাঠ করিতে হয়।

অশোকের পিতার নাম বিন্দুসার, পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ ছিলেন। কূটবুদ্ধি চাণক্যের সাহায্যে তিনি নন্দ-বংশের উচ্ছেদ করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। যবন পণ্ডিতদিগের মতে তিনি কিছুদিন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কোন কারণে আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি প্রাণভয়ে গ্রীক

শিবির হইতে পলায়ন করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদের পার্ব্বত্য সেনাদিগের সাহায্যে গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকাস্ নিকাটর্ চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনীস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ও রাজধানীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য গ্রীক লেখকেরা তাঁহার বিবরণের অনেক অংশ স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। পুরাণ-মতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর ও বিন্দুসার ২৫ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে সাণ্ড্রকোট্টসের (চন্দ্রগুপ্ত) পুত্র অমিট্রখাদেসের (অমিত্রঘাত) দরবারে ডেইমেকস্ নামক গ্রীকদূত আসিয়াছিলেন। তিনিও মেগাস্থিনীসের মত আপনার ভারত-প্রবাসের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিন্দুসার অমিত্রঘাত নামেও পরিচিত ছিলেন এবং সেকালের গ্রীক রাজারা চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের দরবারে দূত পাঠাইতেন।

অশোকের বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। প্রবাদ আছে যে যৌবনে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন ; এই প্রবাদ সত্য নাও হইতে পারে। আরও প্রবাদ আছে যে তিনি পিতার রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিয়াছিলেন। অশোকের উৎকীর্ণ-লিপিতে দেখা যায় যে কোন কোন প্রদেশের শাসনভার রাজকুমারদিগের হস্তে অর্পিত হইত, সুতরাং দ্বিতীয় প্রবাদ একেবারে অমূলক না হইতে পারে। আবার এমন কথাও শুনা যায় যে তিনি সিংহাসনের লোভে ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। উৎকীর্ণ-লিপিতে ভ্রাতাদিগের অবরোধনের কথা থাকায় একালের পণ্ডিতেরা ঐ প্রবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আবার কেহ কেহ

আপত্তি করিয়াছেন যে ভ্রাতাদিগের অবরোধনের উল্লেখ থাকিলেই যে তখন ভ্রাতারাও জীবিত ছিলেন এমন কথা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, এগুলি অনুমান ও তর্ক-বিতর্কের বিষয়। পিতার মৃত্যুর পর যে কারণেই হউক এবং যে উপায়েই হউক অশোক পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন ইহা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু সিংহাসন অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার অভিষেক হইয়াছিল? উৎকীর্ণ-লিপিগুলিতে দেখা যায় যে অশোক বারংবার অভিষেকের বৎসরের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, "অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে আমি এরূপ আজ্ঞা করিলাম", বা "প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের একোনবিংশতি বৎসরে"; কিন্তু "রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে" বা "রাজত্বের একোনবিংশতি বর্ষে" এরূপ পাঠ কোথাও পাওয়া যায় না। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে সিংহাসনারোহণের চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক হইবার যে প্রবাদ আছে তাহা খুব সম্ভব সত্য। উত্তরাধিকার লইয়া যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া থাকে তবে যথারীতি অভিষেক হইতে কয়েক বৎসর বিলম্ব হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু অনুশাসনের প্রত্যেক শব্দে এরূপ বিশিষ্ট অর্থ আরোপ করা সঙ্গত হইবে কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়। সিংহাসনারোহণের বৎসরেই যদি অভিষেক হইয়া থাকে তাহা হইলে রাজত্বের বৎসর ও অভিষেকের বৎসরও অভিন্ন। এদেশে সিংহাসনারোহণ অপেক্ষা অভিষেকের গুরুত্ব বেশী। সুতরাং আপনার কার্য্যাবলীর কথা বলিতে গিয়া অশোক যদি কেবল অভিষেকের বৎসরের কথাই উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা হইতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে তাঁহার অভিষেকে নানা কারণে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। উৎকীর্ণ-লিপিগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে প্রথম জীবনে পিতা ও পিতামহের ন্যায় অশোকও হিন্দু ছিলেন। তখন সাধারণ হিন্দুরাজাদিগের আচার ব্যবহারই তিনি মানিয়া চলিতেন।

অশোকের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কোন কথা না জানিলেও উৎকীর্ণ-লিপিগুলির সাহায্যেই আমরা অনায়াসে তাঁহার কাল নির্ণয় করিতে পারি। হিসাবে সামান্য ভুল হইলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিশ বৎসরের বেশী রাজত্ব করিয়াছিলেন। গিরিলেখমালার দ্বিতীয় অনুশাসনে প্রিয়দর্শী প্রত্যন্ত দেশের রাজা হিসাবে অংতিয়োক-নামক যোন বা যবন রাজার নাম করিয়াছেন। ঐ লেখমালারই ত্রয়োদশ অনুশাসনে তিনি অংতিয়োকের চারিজন প্রতিবেশী যবন রাজারও কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মলিপির ভাষায় ইঁহাদের নাম তুরময়, অংতিকিনি, মক ও অলিকসুদর। যবনরাজ অংতিয়োক রাজত্ব করিতেন অশোকের রাজ্য হইতে ছয়শত যোজন দূরে, অপর চারিজন তাহারও ওধারে। আধুনিক পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় এই পাঁচজন গ্রীক রাজার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে অনুশাসনের অংতিয়োক সিরিয়ার প্রথম অথবা দ্বিতীয় এন্টিয়োকস্, তুরময় মিসরের গ্রীক রাজা দ্বিতীয় টলেমি, অংতিকিনি মাকিদন্ অধিপতি এন্টিগোনস্ গোনাটস্, মক কাইরেনের রাজা মগস্; অলিকসুদর হয় এপিরাসের রাজা আলেকজাণ্ডার, না হয় করিন্থের রাজা আলেকজাণ্ডার। সুতরাং এই সকল রাজা যখন জীবিত ছিলেন তখন অশোকের রাজত্বের অন্ততঃ ১৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। কারণ ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোকের অভিষেকের অষ্টম বৎসরের ঘটনার এবং পঞ্চম অনুশাসনে অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরের ঘটনার উল্লেখ আছে।

এইবার অশোকের উল্লিখিত গ্রীক রাজাদিগের রাজত্বের সময় হিসাব করা যাউক। অংতিয়োক প্রথম কি দ্বিতীয় এন্টিয়োকস্ এবং অনুশাসনের অলিকসুদর এপিরাস্ অথবা করিন্থের রাজা তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত হিসাবে কয়েক বৎসরের গোলমাল

থাকিয়াই যাইবে, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনা ও সময় আলোচনার কালে অল্প কয়েক বৎসরের পার্থক্য ধর্ত্তব্য নহে। সিরিয়ার প্রথম এন্টিয়োকস্ খৃঃ পূঃ ২৮০ হইতে ২৬১ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এন্টিয়োকসের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৬১ হইতে ২৪৬। মিশরের দ্বিতীয় টলেমি বা তুরময় খৃঃ পূঃ ২৮৫ হইতে ২৪৭ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। মাকিদনের এন্টিগোনস্ গোনাটস্ খৃঃ পূঃ ২৭৬ হইতে ২৩৯ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাইরেনের মগস্ খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে ২৫৮ পর্য্যন্ত বিয়াল্লিশ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। করিন্থের আলেকজাণ্ডারের রাজত্ব-কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫২ হইতে ২৪৪ সাল পর্য্যন্ত। অলিকসুদর এপিরাসের রাজা হইলে তাহার শাসনকাল খৃঃ পূঃ ২৭২ হইতে ২৫৫ পর্য্যন্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে অশোকের অভিষেকের অথবা রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষ পড়ে।

উৎকীর্ণ-লিপির প্রমাণের সাহায্যেই অশোকের সাম্রাজ্যের সীমান্ত মোটামুটি অনুমান করা যায়। গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপিগুলি অশোকের সাম্রাজ্যের ভিতরই লেখা হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে উত্তরে দেরাদুন জিলা ও নেপালের তরাই হইতে দক্ষিণে নিজাম রাজ্য ও মহীশূরের চিতলদুর্গ জিলা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে গিরনার ও সোপারা হইতে পূর্ব্বে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে পেশোয়ার ও হাজারা জিলা পর্য্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গিরিলেখমালার দ্বিতীয় অনুশাসনে অশোক প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে আতাম্রপর্ণী চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র এবং অংতিয়োক-নামক যোন রাজার রাজ্য ও তৎসন্নিহিত অন্য রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ অনুশাসনে অংতিয়োক ও তাঁহার প্রতিবেশী-চতুষ্টয়ের এবং চোড়পাণ্ড্যদিগের নাম আছে। এই সকল প্রত্যন্ত দেশ বা প্রত্যন্ত দেশস্থ জাতিদিগের বিষয় সকল কথা আমাদের

জানা না থাকিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে তাম্রপর্ণী* বা সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত চোল, চের, পাণ্ড্যরাজ্য, মালাবার উপকূল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে অংতিয়োকের রাজ্য অশোকের সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল। প্রত্যন্ত দেশের মধ্যে বাঙ্গালার নাম পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি বঙ্গদেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল? তাহা হইলে আধুনিক বাঙ্গালার সীমানার মধ্যে কোন অশোক-লিপি পাওয়া যায় নাই কেন? চীন দেশীয় পরিব্রাজকেরা তাম্রলিপি বা আধুনিক তমলুকে নাকি সম্রাট্ অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ দেখিয়াছিলেন। এখন তমলুক হইতে মৌর্য্য শাসনের এই প্রাচীন নিদর্শন লুপ্ত হইয়াছে। তাম্রলিপ্তি ছিল সমুদ্রের তীরে সমৃদ্ধ বন্দর, তমলুক এখন সমুদ্র হইতে বহুদূরে। কোথায় ভূগর্ভে প্রাচীন তাম্রলিপ্তির সৌধরাজি সমাহিত হইয়াছে কে বলিবে?

হিমালয় হইতে মহীশূর, সুরাষ্ট্র হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত সাম্রাজ্যে প্রিয়দর্শী অশোক আধিপত্য করিতেন তাহার কতটুকু তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন, কতটুকুই বা বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন? গিরিলেখমালার ত্রয়োদশ অনুশাসনে প্রিয়দর্শী কলিঙ্গ বিজয়ের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং কলিঙ্গ রাজ্য তাঁহার পিতা ও পিতামহের শাসনাধীন ছিল না মনে করিলে অন্যায় হইবে না। অভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। তাহার পূর্ব্বে কখনও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া থাকিলেও কলিঙ্গবিজয়ই বোধ হয় তাঁহার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

অনুশাসনের প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে অশোকের সাম্রাজ্যের পরিসর ছিল পশ্চিমে এন্টিয়োকসের রাজ্যের সীমান্ত

* কেহ কেহ বলেন ইহা টিন্নেভেল্লি জিলার একটি নদীর নাম।

হইতে পূর্ব্বে কলিঙ্গ অবধি আর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে চোল, চের, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত। কলিঙ্গ অশোক নিজে জয় করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া থাকিবেন।

এই বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কতকগুলি নগর ও প্রদেশের নামও অশোকের অনুশাসনে আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কলিকাতা-বৈরাট শিলালিপির প্রারম্ভে অশোক "মাগধ" বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইতিহাসেও বলে যে মগধেই চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার রাজত্ব করিতেন। সেকালে মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে বা বর্ত্তমান পাটনায়। সুতরাং গিরনার গিরিলেখমালার পঞ্চম অনুশাসনে অশোক যখন "পাটলিপুত্রে ও বাহিরে" তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের অবরোধনের কথা বলিতেছেন এবং অন্যত্র পাটলিপুত্রের পরিবর্ত্তে "হিদ" (অর্থাৎ অত্র) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন তখন তিনি যে রাজধানী হিসাবেই পাটলিপুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকে না। এখন আমরা যে অর্থে সচরাচর চলিত ভাষায় "কলিকাতায় ও মফঃস্বলে" বলিয়া থাকি গিরিলেখমালার পঞ্চম অনুশাসনের "পাটলিপুত্রে ও বাহিরে" সেইরূপ অর্থেই লেখা হইয়া থাকিবে।

পাটলিপুত্র ব্যতীত মগধের আরও একটি নগরের নাম অশোকের অনুশাসনে পাওয়া যায়। গিরিলেখমালার অষ্টম অনুশাসনে আছে যে অভিষেকের দশমবর্ষে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী "সম্বোধি" গমন করিয়াছিলেন। সম্বোধি বর্ত্তমান বোধগয়া, যেখানে শাক্যমুনি বোধি লাভ করিয়াছিলেন।

ধৌলির অতিরিক্ত অনুশাসন দুইটিতে "তোসলিয়ং মহামাতা" বা তোসলীর মহামাত্র এবং জৌগড়ের অতিরিক্ত অনুশাসন দুইটিতে

"সমাপায়ং মহমতা" বা সমাপার মহামাত্রদিগকে অশোকের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তোসলীতে একজন "কুমার" থাকিতেন। সুতরাং নববিজিত কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী তোসলীতে ছিল মনে করা অসঙ্গত হইবে না। আর জৌগড় অঞ্চলের শাসনকেন্দ্রের নাম বোধ হয় সমাপা ছিল। সেকালে জৌগড় পাহাড়ের নাম ছিল "খেপিংগল"।

ধৌলী লিপিতে "উজেনি" ও "তখসিলা"র উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য উজেনি কালিদাসের "উজ্জয়িনী", বর্ত্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত উজ্জৈন। তখসিলা বৌদ্ধ সাহিত্যের তক্ষশিলা। এক সময় তক্ষশিলা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তক্ষ-শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। কানিংহামের মতে পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জিলার অন্তর্গত শাহধেরিই প্রাচীন তক্ষশিলা।

মহীশূরের ব্রহ্মগিরি ও সিদ্দাপুর শৈললেখমালার প্রারম্ভে সুবর্ণ-গিরিস্থ আর্য্যপুত্র ও তাঁহার মহামাত্রেরা ইসিলের মহামাত্রদিগের কুশল কামনা করিতেছেন। বোধ হয় সুবর্ণগিরি দক্ষিণাপথের একটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল এবং ইসিল তাহার অধীন কোন বিভাগীয় শাসনকেন্দ্র। কেহ কেহ মনে করেন যে মৌর্য্যযুগে সিদ্দাপুরের নাম ছিল "ইসিল"। মস্‌কির দক্ষিণস্থ কনকগিরিই হয়ত অনুশাসনের সুবর্ণগিরি। সেকালে পাটলিপুত্র, কুসুমপুর এবং পুষ্পপুর নামেও পরিচিত ছিল। কুসুমপুর এবং পুষ্পপুরের ন্যায় কনকগিরি ও সুবর্ণ-গিরিও সমানার্থক শব্দ।

এলাহাবাদ স্তম্ভলেখমালার একটি অনুশাসনে দেখা যায় যে দেবানাং প্রিয় "কোসংবিয়ং মহামাত" বা কৌশাম্বীর মহামাত্রদিগকে আজ্ঞা করিতেছেন। পণ্ডিতদিগের মতে এলাহাবাদের নিকট যমুনার বামতীরে অবস্থিত কোসম্ গ্রাম ও প্রাচীন কৌশাম্বী অভিন্ন।

রুম্মিনদেঈর লাট-লিপি হইতে "লুংমিনি" বা লুম্বিনীগ্রামে শাক্য-মুনি বুদ্ধের জন্ম-স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অভিষেকের বিংশতি বৎসরে অশোক স্বয়ং এইখানে আসিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং স্তম্ভ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। বরাবর-পাহাড়ের একটি গুহা-লিপি হইতে জানা যায় যে অশোকের সময়ে ঐ পাহাড়ের নাম ছিল "খলতিক"। "অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে খলতিক-পর্ব্বতস্থ এই গুহা প্রিয়দর্শী রাজা কর্ত্তৃক আজীবিকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল।"

গিরিলেখমালার পঞ্চম অনুশাসনে যোন, কম্বোজ, গন্ধার, রঠিক, পিতিনিক এবং ত্রয়োদশ অনুশাসনে যোন, কম্বোজ, নাভক, নাভপংতি, ভোজ, পিতিনিক, অন্ধ্র ও পারিন্দদিগের নাম আছে। এই সকল জাতির সম্বন্ধে সকল কথা আমরা জানি না। তাহাদের সহিত অশোকের সাম্রাজ্যের কি সম্পর্ক ছিল তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। পঞ্চম অনুশাসনে অশোক ইহাদিগকে "অপরান্ত" বলিয়াছেন। অংতিয়োক প্রভৃতি যবন রাজা এবং আতাম্রপর্ণি চোল, চের প্রভৃতি যে সকল রাজ্য নিঃসন্দেহে অশোকের সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল তাহাদিগকে "প্রত্যন্ত" বা "অন্ত" বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা "অপরান্ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন পশ্চিম সীমান্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যোন, কম্বোজ, গন্ধার, রঠিক বা রাষ্ট্রিক ও পিতিনিকগণ অশোকের রাজ্যের পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। এই কয়েকটি জাতির মধ্যে যোন, কম্বোজ ও পিতিনিকদিগের নাম ত্রয়োদশ অনুশাসনেও পাওয়া যাইতেছে এবং সেখানে বলা হইয়াছে যে ইহারা অশোকের রাজ্যের ভিতরেই বাস করিত। যোনেরা যবন বা গ্রীক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বোধ হয় তাহাদের রাজ্য ছিল এবং তাহারা বোধ হয় চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। কম্বোজ ও গন্ধারেরা বোধ হয় যবনদিগের প্রতিবেশী ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে বর্ত্তমান কাবুলের নিকট কম্বোজ রাজ্য ছিল। অশোকের কালে বোধ হয়

তক্ষশিলায় গন্ধারদিগের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে তাহাদের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। কাথিয়া-বাড় অথবা মহারাষ্ট্রে হয়ত রঠিকদিগের জনপদ ছিল। পিতিনিক কাহারা আমরা জানি না। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে পিতিনিক কোনও পৃথক্ জাতিবাচক শব্দ নহে, রঠিক ও ভোজদিগের বিশেষণ। অন্ধ্রেরা পরবর্ত্তীকালে বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও অন্ধ্রদেশ সকলের নিকট সুপরিচিত। পারিন্দ বা পুলিন্দেরা হয়ত মধ্যপ্রদেশের অরণ্যবাসী বর্ব্বর জাতি। নাভক ও নাভপংতিদিগের নিবাস কোন অঞ্চলে ছিল তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে স্থির হয় নাই। নাভকেরা হয়ত তরাই প্রদেশে বাস করিত। ভোজেরা কাহারও কাহারও মতে পশ্চিম ভারতের অধিবাসী, আবার কেহ কেহ মনে করেন যে তাঁহারা বিদর্ভ বা বর্ত্তমান বেরারে বাস করিতেন। এখানে সে সকল জটিল আলোচনার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন। এই জাতিগুলি বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে মৌর্য্যসম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে নাই বলিয়া তাহাদিগের নাম পৃথক্রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। হয়ত বা অশোকের সাম্রাজ্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ছিল বর্ত্তমান কালের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ উপজাতিসমূহের মত।

অশোকের অনুশাসন হইতে তাঁহার রাজ্যশাসন-পদ্ধতিরও কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য অশোকের সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি প্রদেশের শাসনভার রাজপরিবারের যোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। অশোক-অনুশাসনে দেখা যায় যে তোসলীর ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তাকে "কুমার" এবং সুবর্ণগিরির শাসনকর্ত্তাকে "আর্য্যপুত্র" বলা হইয়াছে। আর্য্যপুত্র ও কুমারের মধ্যে নিশ্চয়ই পদমর্য্যাদার পার্থক্য ছিল, তাহা না হইলে উপাধির পার্থক্য হইত না। কুমারেরা অশোকের পুত্র বা ভ্রাতা হইতে

পারেন। আর্য্যপুত্রের সহিত রাজার রক্ত-সম্পর্ক থাকিলেও তাহা হয়ত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না, এবং আর্য্যপুত্র হয়ত অশোকের কোন পূজনীয় জ্ঞাতির পুত্র ছিলেন। ধৌলি ও জৌগড়ের প্রথম অতিরিক্ত অনুশাসনের শেষাংশ হইতে মোটামুটি একটা অনুমান করা যায় যে তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তাও ছিলেন একজন কুমার। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে নববিজিত কলিঙ্গ দেশ, উত্তর-পশ্চিমে যোন-কম্বোজ-গন্ধার রাজ্যের সন্নিহিত প্রদেশ, দক্ষিণ সীমান্তস্থিত প্রদেশ, এবং মধ্যভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন অবন্তী দেশের (উজ্জয়িনীর) শাসনকার্য্যের জন্য রাজপরিবার হইতে লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই চারিটি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় রাজার একান্ত বিশ্বাসভাজন আত্মীয়গণকে তোসলী, তক্ষশিলা, সুবর্ণগিরি ও উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি-স্বরূপ পাঠান হইয়াছিল। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে অশোক নিজেও পিতার জীবিতকালে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার কাজ করিয়াছিলেন। রুদ্রদামনের গিরনার-লিপি হইতে জানা যায় যে অশোকের সময়ে যবনরাজা তুষাস্প সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বিভিন্ন অনুশাসনে কুমার ও আর্য্যপুত্র ব্যতীত নিম্নলিখিত রাজকর্ম্মচারীগণের নাম পাওয়া যায় :—

১। মহামাত্র
২। রাজুক
৩। প্রাদেশিক
৪। যুত
৫। পুরুষ
৬। প্রতিবেদক

পদমর্য্যাদায় রাজ-প্রতিনিধির পরেই মহামাত্রদিগের স্থান। মহামাত্রদিগের মধ্যে আবার বিভিন্ন পর্য্যায় বা শ্রেণী ছিল। যে

মহামাত্রেরা উজ্জয়িনী ও তোসলীর কুমারদ্বয়ের এবং সুবর্ণগিরির আর্য্যপুত্রের সহযোগিতা করিতেন তাঁহারা এবং যে মহামাত্রেরা সমাপা ও ইসিলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাঁহারা সমশ্রেণীর কর্ম্মচারী হইতে পারেন না। আবার কৌশাম্বীর মহামাত্রেরা বোধ হয় তোসলী, উজ্জয়িনী ও সুবর্ণগিরির মহামাত্রদিগের অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় ও ক্ষমতায় উচ্চে ছিলেন। কারণ তাঁহারাই কৌশাম্বী শাসন করিতেন, কোনও কুমার বা আর্য্যপুত্রের নির্দ্দেশ তাঁহাদিগকে মানিতে হইত না। তোসলী ও সমাপার মহামাত্রেরা "নগর-ব্যবহারক" বা বিচারকের কার্য্যও করিতেন। কলিঙ্গের সন্নিহিত সীমান্তবাসী আরণ্য জাতিদিগের ব্যবস্থাও তাঁহাদিগকে করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে অশোক কতকগুলি "ধর্ম্ম-মহামাত্র" নিযুক্ত করেন। প্রজাসাধারণের নৈতিক উন্নতি-বিধানের দায়িত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। অনুশাসনে "স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্র"-নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নামও পাওয়া যায়। নারীজাতির মঙ্গলবিধানের জন্য বোধ হয় ইঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজুকেরা বোধ হয় রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। জমির জরিপ ও বন্দোবস্ত তাঁহারা করিতেন। অশোকের সময়ে বহুলক্ষ লোকের শাসনভার ইঁহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং ইঁহাদিগকে বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। প্রাদেশিকেরা বোধ হয় ছোট খাট বিভাগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যুত বা যুক্তেরা মহামাত্রদিগের দপ্তরে কাজ করিতেন। পুরুষ গুপ্তচরের নামান্তর। সেকালে রাজাদিগের গুপ্তচর না হইলে চলিত না। প্রতিবেদকেরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। আহার, বিহার এবং বিশ্রামের সময়েও প্রতিবেদকেরা বিনা বাধায় খবর লইয়া রাজার নিকট যাইতে পারিত।

ইঁহাদিগের সকলের উপরে ছিলেন রাজা। কুমার ও আর্য্যপুত্র

হইতে পুরুষ ও প্রতিবেদক পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীকেই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত। রাজ্যের মধ্যে রাজার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। তিনিই ছিলেন সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সুখদুঃখের বিধাতা। তবে তিনিও কতকগুলি সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নিয়ম সহসা লঙ্ঘন করিতেন না। বুদ্ধিমান্ রাজা স্বার্থের খাতিরে প্রজাদিগের উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেন না। অশোকের মত হৃদয়বান্ রাজা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিতেন। অশোকের অনুশাসনে "পরিসা" অর্থাৎ 'পরিষদে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। শাসনকার্য্যে রাজা বোধ হয় এই পরিষদ্ অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে অশোকের সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে বড় বড় প্রদেশগুলির শাসনভার রাজপরিবারের কুমার ও আর্য্যপুত্রদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। মহামাত্র-নামক কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেন। কতকগুলি প্রদেশ মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের শাসনভার ছিল মহামাত্র, রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের হস্তে। ধর্ম্ম-মহামাত্রেরা প্রজাদিগের নৈতিক ও পারলৌকিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। পুরুষ ও প্রতিবেদকদিগের মুখে রাজা রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাইতেন। অর্থাৎ শাসনযন্ত্রের কাঠামো এখনও যেমন তখনও অনেকটা সেই রকমই ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান-আমলেও তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রাজা সুবিবেচক হইলে এই শাসনতন্ত্রেই প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইত, আবার রাজা অবিবেচক হইলে, উৎপীড়ক হইলে, প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্যের অবধি থাকিত না।

এইবার অনুশাসন হইতে অশোকের জীবনের বড় বড় কয়েকটি ঘটনার কালপঞ্জী দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

১। অভিষেকের অষ্টম বৎসরে—কলিঙ্গ-বিজয় (গিরি-লেখমালা, ত্রয়োদশ অনুশাসন)

২। দশম বৎসরে—সম্বোধি বা বোধগয়ায় গমন (গিরি-লেখমালা, অষ্টম অনুশাসন)

৩। দ্বাদশ বৎসরে—

(ক) কর্ম্মচারীদিগকে পাঁচ বৎসর অন্তর রাজ্য-পরিদর্শন করিতে নির্দ্দেশ (গি—লে, ৩)

(খ) নৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা (গি—লে, ৪)

(গ) ধর্ম্মলিপি লেখান (স্তম্ভলেখমালা, ষষ্ঠ অনুশাসন)

(ঘ) বরাবর-পাহাড়ে আজীবিকদিগকে দুইটি গুহা দান (গুহা লিপি)

৪। ত্রয়োদশ বৎসরে—ধর্ম্মমহামাত্র-নিয়োগ (গি—লে, ৫)

৫। চতুর্দ্দশ বৎসরে—কনকমুনির স্তূপ-সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন (নিগালীসাগর লাট-লেখ)

৬। উনবিংশতি বৎসরে—বরাবর-পাহাড়ে তৃতীয় গুহা দান (গুহা লিপি)

৭। বিংশতি বৎসরে—লুম্বিনী-উদ্যান ও কনকমুনির স্তূপে গমন (রুম্মিন্‌দেঈ ও নিগালীসাগর লাট-লেখ)

৮। ষড়্‌বিংশতি বৎসরে—স্তম্ভ-লেখমালার প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুশাসন প্রচার

৯। সপ্তবিংশতি বৎসরে—দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসন প্রচার

হইতে পুরুষ ও প্রতিবেদক পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীকেই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত। রাজ্যের মধ্যে রাজার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। তিনিই ছিলেন সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সুখদুঃখের বিধাতা। তবে তিনিও কতকগুলি সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নিয়ম সহসা লঙ্ঘন করিতেন না। বুদ্ধিমান্ রাজা স্বার্থের খাতিরে প্রজাদিগের উপর অযথা উৎপীড়ন করিতেন না। অশোকের মত হৃদয়বান্ রাজা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিতেন। অশোকের অনুশাসনে "পরিসা" অর্থাৎ 'পরিষদে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। শাসনকার্য্যে রাজা বোধ হয় এই পরিষদ্ অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে অশোকের সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে বড় বড় প্রদেশগুলির শাসনভার রাজপরিবারের কুমার ও আর্য্যপুত্রদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। মহামাত্র-নামক কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেন। কতকগুলি প্রদেশ মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের শাসনভার ছিল মহামাত্র, রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের হস্তে। ধর্ম্ম-মহামাত্রেরা প্রজাদিগের নৈতিক ও পারলৌকিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। পুরুষ ও প্রতিবেদকদিগের মুখে রাজা রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাইতেন। অর্থাৎ শাসনযন্ত্রের কাঠামো এখনও যেমন তখনও অনেকটা সেই রকমই ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান-আমলেও তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রাজা সুবিবেচক হইলে এই শাসনতন্ত্রেই প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইত, আবার রাজা অবিবেচক হইলে, উৎপীড়ক হইলে, প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্যের অবধি থাকিত না।

এইবার অনুশাসন হইতে অশোকের জীবনের বড় বড় কয়েকটি ঘটনার কালপঞ্জী দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

১। অভিষেকের অষ্টম বৎসরে—কলিঙ্গ-বিজয় (গিরি-লেখমালা, ত্রয়োদশ অনুশাসন)

২। দশম বৎসরে—সম্বোধি বা বোধগয়ায় গমন (গিরি-লেখমালা, অষ্টম অনুশাসন)

৩। দ্বাদশ বৎসরে—

(ক) কর্ম্মচারীদিগকে পাঁচ বৎসর অন্তর রাজ্য-পরিদর্শন করিতে নির্দ্দেশ (গি—লে, ৩)

(খ) নৈতিক উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা (গি—লে, ৪)

(গ) ধর্ম্মলিপি লেখান (স্তম্ভলেখমালা, ষষ্ঠ অনুশাসন)

(ঘ) বরাবর-পাহাড়ে আজীবিকদিগকে দুইটি গুহা দান (গুহা লিপি)

৪। ত্রয়োদশ বৎসরে—ধর্ম্মমহামাত্র-নিয়োগ (গি—লে, ৫)

৫। চতুর্দ্দশ বৎসরে—কনকমুনির স্তূপ-সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন (নিগালীসাগর লাট-লেখ)

৬। ঊনবিংশতি বৎসরে—বরাবর-পাহাড়ে তৃতীয় গুহা দান (গুহা লিপি)

৭। বিংশতি বৎসরে—লুম্বিনী-উদ্যান ও কনকমুনির স্তূপে গমন (রুম্মিন্‌দেঈ ও নিগালীসাগর লাট-লেখ)

৮। ষড়্‌বিংশতি বৎসরে—স্তম্ভ-লেখমালার প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুশাসন প্রচার

৯। সপ্তবিংশতি বৎসরে—দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসন প্রচার

৫

অশোকের ধর্ম্ম

এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর নহে। অশোক কত বড় রাজা ছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার সাম্রাজ্য কত বড় ছিল জানা দরকার। কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম, সে বংশের অবদান কি, তাহা না জানিলে অশোকের আদর্শের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের আদর্শের পার্থক্য কোথায় ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। অশোকের ধর্ম্মনীতি জানিতে হইলে তাঁহার ধর্ম্মলিপির খবর লইতেই হইবে।

কিন্তু দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র বলিয়া অশোকের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয় নাই। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের আরও অনেক পৌত্র ছিলেন, ইতিহাস তাঁহাদের সংবাদ রাখে না। বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি বলিয়া অশোকের এত খ্যাতি হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। আরও অনেক রাজা অধিকতর বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের দেশের বাহিরে আজ তাঁহাদের নাম কেহ স্মরণ করে না। ধর্ম্ম-নীতির জন্যই অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং সে হিসাবে কলিঙ্গ-বিজয় তাঁহার জীবনে এক সন্ধিক্ষণ সূচনা করিতেছে।

গিরিলেখমালার ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোক কলিঙ্গ-বিজয়ের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর কোন দিগ্বিজয়ী বীর এমন করিয়া বিজিত দেশের হতাহত, শোকার্ত্ত, গৃহহীন, আশ্রয়হীন নরনারীর জন্য অশ্রুপাত করেন নাই ; আর কোন সার্ব্বভৌম নরপতি

এমন অকপটে সকলের অবগতির নিমিত্ত আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার স্বীকারোক্তির মধ্যে কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা নাই, কোথাও আত্মসমর্থনের এতটুকু চেষ্টা লক্ষিত হয় না। তিনি যেমন নির্ম্মম-ভাবে কলিঙ্গ-বিজয় সমাধা করিয়াছিলেন, তেমনই যুদ্ধ শেষ হইবার পর যখন দেখিলেন যে তাঁহার অভিযানের ফলে দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত হইয়াছে, লক্ষ মানুষ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং তাহার চেয়ে অনেক বেশী মরিয়াছে অন্যান্য কারণে, তখনই তাঁহার চিত্ত করুণায় বিগলিত হইয়াছিল। সেই দিন হইতে তিনি দিগ্বিজয়ের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার রাজ্যে সেই দিন হইতে "ভেরীঘোষ" স্তব্ধ হইল, এবং মৃগয়া প্রভৃতি জীবঘাতী ব্যসনে তিনি সেই দিন হইতে বিমুখ হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি মনুষ্য-মাত্রের জীবসাধারণের মঙ্গল-সাধনে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ধর্ম্মানুশীলন, "ধর্ম্মকামতা" ও "ধর্ম্মানুশস্তি" তখন হইতে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ অশোকের জীবনের একমাত্র ব্রত হইল।

অনুশাসনের মধ্যে আমরা অশোকের হৃদয়ের যতটুকু পরিচয় পাই তাহাতে মনে হয় তিনি একদিকে যেমন স্নেহপ্রবণ অন্যদিকে তেমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। সন্তান ও আত্মীয়দিগের কথা তিনি স্নেহের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। স্নেহভাজনদিগের ইহলৌকিক মঙ্গল-কামনায় তাঁহার মমতা সীমাবদ্ধ রহে নাই, তিনি তাঁহাদের পারলৌকিক মঙ্গল-কামনাও করিয়াছেন। প্রজাদিগকে তিনি আপন সন্তান বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রাজা,—প্রজাদিগের নিকট "রাজভাগ" বা কর আদায় করিতেন। এই কর তিনি ঋণ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার মতে প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারের মঙ্গল-সাধনই ছিল এই ঋণ-পরিশোধের একমাত্র উপায়। তিনি আরও জানিতেন যে "কল্যাণ দুষ্কর" এবং "পাপ সুকর" এবং সেই

জন্য অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ এত প্রবল ছিল,—সন্তানের প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, প্রজার প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, জীব-সাধারণের প্রতি তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে এমন সচেতন ছিলেন যে, সে কারণে কোন ক্লেশ, কোন অসুবিধা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রজাবৎসল নরপতি তাঁহার কর্ম্মচারী রাজুকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে নিপুণা ধাত্রীর হস্তে পিতা যেরূপ নিশ্চিন্ত মনে সন্তান-পালনের ভার দিয়া থাকেন, তিনিও তাঁহাদের হস্তে সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রজা-পালনের ভার দিয়াছেন। তিনি প্রতিবেদকগণকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন, প্রজার সংবাদ আমাকে দিতে ইতস্ততঃ করিও না, আহারের সময়ে, অন্তঃপুরে, শয়নকক্ষে, এমন কি ব্রজের (বর্চ্চের) কোনখানে অথবা উদ্যানে আমাকে রাজ্যের সংবাদ দিতে বিলম্ব করিও না। এরূপ প্রজাবৎসল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্রাট্ যে কেবল নিজের মঙ্গলের পথ সন্ধান করিবেন না, শান্তির পথের সন্ধান পাইলে তিনি যে নিজের সন্তানসন্ততি প্রকৃতিপুঞ্জকেও সেই পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন—ইহাই ত স্বাভাবিক।

কলিঙ্গ-অভিযানের পর শোকের, বেদনার ভিতর দিয়া অশোক শান্তির পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিস্তৃত কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া তিনি সুখী হইতে পারিলেন না। প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাঁহার চিত্তে তৃপ্তি আসিল না। পরন্তু লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত নরনারীর শোক ও বেদনা তিনি আপনার হৃদয়ে অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন—লোভে সুখ নাই, হিংসায় শান্তি নাই, হত্যায় তৃপ্তি নাই; ত্যাগ সংযম ও অহিংসাই সুখ, শান্তি, তৃপ্তি ও মঙ্গলের উপায়। কেবল ইহলোকের কথা ভাবিলেই চলিবে না, পরলোকের মঙ্গলের ব্যবস্থাও করিতে হইবে এবং তাহার জন্য চলিতে হইবে দুষ্কর ধর্ম্মের পথে। অশোক যদি কেবল নিজের কথা ভাবিতেন, তাহা হইলে

অনায়াসে পাটলিপুত্রের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পিতার কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য, মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই বলিয়াই রাজত্ব ত্যাগ না করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে ধর্ম্ম আচরণ করিবার জন্য অশোক তাঁহার প্রজাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা নাই। তাঁহার ধর্ম্মমত দেশ ও কালের অতীত, সকল দেশে, সকল যুগেই তাহার সমান আদর হইবে। তিনি তাঁহার অনুশাসনে দ্বাদশটি গুণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন,—

১। দয়া
২। দানশীলতা
৩। সত্যানুরাগ
৪। শৌচ (শুচিতা)
৫। মার্দব (মৃদুতা)
৬। সাধুতা
৭। অল্পব্যয় ও অল্প সঞ্চয় ("অপবয়তা" ও "অপভংডতা")
৮। সংযম
৯। ভাবশুদ্ধি
১০। কৃতজ্ঞতা
১১। দৃঢ়ভক্তি
১২। ধর্ম্মরতি

উপরিলিখিত গুণ বা বৃত্তিগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। সংযম না থাকিলে ব্যয় ও সঞ্চয়ে আতিশয্য আসিয়া পড়িবে। সংযম থাকিলে ধর্ম্মরতি সম্ভব হইবে। ধর্ম্মরতি হইলে দৃঢ়ভক্তি আপনিই আসিবে এবং ভাবশুদ্ধিও হইবে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে শৌচ, মার্দব ও সত্যানুরাগ সম্ভব হইবে না। এই সকল

গুণ থাকিলে দয়া, দানশীলতা, কৃতজ্ঞতা ও সাধুতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। সাধুব্যক্তি স্বভাবতঃই সত্যনিষ্ঠ ও সংযতচিত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকের নানাপ্রকার দুর্ব্বলতা থাকে। সর্ব্বপ্রকারের সংযমে সাধারণ লোকেরা অভ্যস্ত নহে। সুতরাং এই গুণগুলির অনুশীলন করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শারীরিক উন্নতির জন্য যেমন নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রয়োজন, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধির জন্যও নিয়মিত ভাবে কতকগুলি কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। অশোকের অনুশাসনে ধর্ম্মরতি বা ধর্ম্মকামতার অনুকূল কার্য্যাবলীও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

১। শুশ্রূষা বা আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। কাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে? প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—পিতামাতার, বয়োজ্যেষ্ঠদিগের, গুরুর, উচ্চজাতির ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির।

২। অপচিতি বা শ্রদ্ধা। কাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে? "গুরুর প্রতি অপচিতি সাধু" এবং "অন্তেবাসী (ছাত্র) আচার্য্যকে অপচিতি করিবে।"

৩। "সংপটিপটি" বা উপযুক্ত ব্যবহার। ইহার পাত্র কাহারা? ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, জ্ঞাতিগণ, দাস ও ভৃত্যেরা, দীন-দুঃখীরা, মিত্র, পরিচিত জন ও সহচরেরা।

৪। দান। অশোকের মতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, মিত্র, পরিচিত জন ও জ্ঞাতিরা এবং বয়োবৃদ্ধেরা দানের যোগ্য পাত্র।

৫। প্রাণিদিগের "অনারংভ" বা অহিংসা; প্রাণিপীড়নে সংযম, সর্ব্বভূতে অহিংসা, সর্ব্বভূতের অক্ষতি।

অশোক যেমন ধর্ম্মরতি বা ধর্ম্মকামতার পরিপন্থী বলিয়া প্রাণিহিংসা এবং প্রাণিপীড়ন হইতে সকলকে বিরত হইতে বলিয়াছেন, তেমনই পাঁচটি "আসিনব" বা পাপ হইতেও নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই পাঁচটি পাপ হইতেছে চণ্ডভাব, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ,

মান (অহঙ্কার) ও ঈর্ষা। প্রিয়দর্শীর মতে অপুণ্য বা পাপ পরিহার করাই ধর্ম্ম; ধর্ম্মরতি বা ধর্ম্মকামতা থাকিলে, পাপে ভয় ও ধর্ম্মে উৎসাহ থাকিলে, পাপ পরিহার করা যায়। ইহার জন্য গুরুভক্তি ও আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, অশোক ধর্ম্মের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে-কোন ধর্ম্মের, যে-কোন সম্প্রদায়ের, যে-কোন জাতির লোকই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারেন। অশোকের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত জগতের কোন ধর্ম্মমতেরই অনৈক্য হইতে পারে না। বরং যে নীতিগুলিকে তিনি মানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের সোপান বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই প্রচলিত সকল ধর্ম্মমতের মূল ভিত্তি।

এখন দেখা যাউক অশোক অপরকে যে উপদেশ দিয়াছেন, নিজে তাহার কতটা প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি যে সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই, তাহার প্রমাণ গিরিলেখমালার প্রথম অনুশাসনে পাওয়া যাইতেছে। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে প্রাণিহিংসা হইতে তিনি একেবারে বিরত হইতে পারেন নাই। কিন্তু এ বিষয়েও তাঁহার সংযম ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। গিরিলেখমালার প্রথম অনুশাসনে তিনি বলিয়াছেন—"পূর্ব্বে দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রন্ধনশালায় ব্যঞ্জনের নিমিত্ত বহুলক্ষ প্রাণিহত্যা হইত। কিন্তু এখন এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইবার সময় প্রত্যহ ব্যঞ্জনের জন্য মাত্র দুইটি ময়ূর ও একটি মৃগ—এই তিনটি মাত্র প্রাণিহত্যা হইতেছে। প্রত্যহ মৃগ-হত্যা হয় না। ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রাণিহত্যাও হইবে না।" জীবহত্যা সম্পূর্ণরূপে রহিত না হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী কালের জীবহিংসার তুলনায় তাঁহার রন্ধনশালায় কখন দুইটি ময়ূর, কখনও বা তদতিরিক্ত একটি মৃগবধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। মনে রাখিতে হইবে যে ভবিষ্যতে আহারের জন্য জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইবার সাধু সঙ্কল্প তাঁহার ছিল।

আহারের জন্য অল্পসংখ্যক পশুবধ করিলেও সম্রাট্ অশোক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের মত জীবহিংসায় আমোদ-বোধ ও আকরণে প্রাণিহত্যা করিতেন না। গিরিলেখমালার অষ্টম অনুশাসন হইতে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে রাজারা বিহার-যাত্রায় বাহির হইতেন এবং তদুপলক্ষে মৃগয়া ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানে আনন্দ লাভ করিতেন, কিন্তু প্রিয়দর্শী বিহার-যাত্রা বন্ধ করিয়া ধর্ম্ম-যাত্রার (বা তীর্থ-ভ্রমণের) ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মলিপিগুলিতেই তাঁহার ধর্ম্ম-যাত্রার উল্লেখ আছে। অভিষেকের দশম বৎসরে তিনি সম্বোধি বা বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন। অভিষেকের বিংশতি বর্ষে কনকমুনি-বুদ্ধের স্তূপে ও শাক্যমুনি-বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী-উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন এবং পূজা-অর্চ্চনাদি করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মযাত্রা-উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দর্শন করিতেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে দান বিতরণ করিতেন, বৃদ্ধদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে "হিরণ্য"-দানে প্রতিপালন করিতেন, এবং জনপদের অধিবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যথোপযুক্ত প্রশ্ন করিয়া উপদেশ দিতেন। অশোক স্বয়ং বলিয়াছেন যে দানের মধ্যে ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ দান। এই ধর্ম্মদানের জন্যই তিনি ধর্ম্ম-ঘোষণা ও গিরিগাত্রে এবং শিলাস্তম্ভে ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাজা অশোক যে কেবল ধর্ম্মপ্রচারের সময়ে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও বয়োবৃদ্ধদিগকে দান করিতেন তাহা নহে। দিল্লী-তোপরার স্তম্ভলেখমালার সপ্তম অনুশাসনে দেখিতে পাই যে, তাঁহার ধর্ম্ম-মহামাত্রেরা এবং অন্যান্য প্রধান মন্ত্রী (মুখ্য) গণও তাঁহার ও তাঁহার রাজ্ঞীদিগের দান রাজধানীতে ও বিভিন্ন প্রদেশে যোগ্য-পাত্রে সর্ব্বদা বিতরণ করিতেন। তিনি অপর কতকগুলি কর্ম্মচারীকে তাঁহার পুত্রগণের ও অন্য দেবীকুমারদিগের দান বিতরণ করিতে

আদেশ করিয়াছিলেন। এই দেবীকুমারেরা বোধ হয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়-স্থানীয় হইবেন। পূর্ব্বতন রাজাদিগের দাসী-পুত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে দেবীকুমার বলিতেন না। অপর পক্ষে, তাঁহারা তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষীদিগের গর্ভজাত সন্তান হইলে তাঁহাদিগকে নিজের পুত্র বলিয়া উল্লেখ না করিবার অর্থ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল একা সম্রাট্ অশোক নহেন, তাঁহার পত্নী, পুত্র ও স্বজনবর্গও ধর্ম্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দানে ব্যাপৃত ছিলেন। এলাহাবাদ-স্তম্ভে রাণী কারুবাকীর অনুশাসন হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু কেবল দান করিয়াই অশোকের সেবাপ্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় নাই। মনুষ্য ও পশুদিগকে ছায়া-প্রদানের জন্য তিনি পথের ধারে বটবৃক্ষ ও আম্রবাটিকা রোপণ করাইয়াছিলেন, আট ক্রোশ অন্তর পথের ধারে ধারে কূপ খনন করাইয়াছিলেন ও সেই কূপের ভিতরে অবতরণ করিবার জন্য সোপান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পশু ও মনুষ্যদিগের বিশ্রামের জন্য তিনি স্থানে স্থানে বহু বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাও পথিপার্শ্বে ছায়াতরু-রোপণ, জলাশয়-খনন ও পান্থশালা-নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ও অশোকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অশোক কেবল মানুষের দৈহিক ক্লেশ দূর করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করেন নাই, তিনি আশা করিতেন যে ইহাতে তাঁহার প্রজাদিগের মনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

অশোকের বাৎসল্য কেবল আপনার প্রজাদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহে নাই। তিনি মনে করিতেন না যে তাঁহার প্রজাদিগের কল্যাণ সাধন করিতে পারিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। গিরিলেখমালার দ্বিতীয় অনুশাসনে দেখিতে পাই যে পররাজ্যের মনুষ্য ও পশু তাঁহার অনুকম্পা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। প্রিয়দর্শী

নিজের রাজ্যের সর্ব্বত্র ও চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, তাম্রপর্ণী বা সিংহল দেশে এবং অংতিয়োক নামক যবন রাজা ও অংতিয়োকের প্রতিবেশীদিগের রাজ্যে মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেখানে মনুষ্য ও পশুর উপযোগী ভেষজ ছিল না সেখানে তিনি ঐ সকল তরু, গুল্ম ও লতা রোপণ করাইয়াছিলেন; যেখানে আহারের যোগ্য ফল-মূল ছিল না সেখানে তাহা আনাইয়া রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; পশু ও মনুষ্যের উপভোগের জন্য তিনি পথে পথে কূপ খনন ও বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন। দেশে বিদেশে, মনুষ্য ও পশু সমান ভাবে অশোকের দয়া লাভ করিয়াছে। তাঁহার সন্তান-বাৎসল্য প্রজাবাৎসল্যে, প্রজা-হিতৈষণায়, এবং নরসেবা জীবসেবায় পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু অশোকের অনুশাসনে অহিংসা, দান, সত্য, অপচিতি ও "সম্প্রতিপত্তি" প্রভৃতি যে সকল গুণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র। কেবল ইহা হইতে অশোকের ধর্ম্মানুরাগের তীব্রতা কল্পনা করা যাইবে না। দানের পশ্চাতে, সেবার মূলে, ধনের অভিমান কিংবা খ্যাতির লোভ থাকিতে পারে। প্রত্যক্ষ হিংসার কার্য্য হইতে বিরতি আলস্য-কারণেও জন্মিতে পারে। কেবল সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও ব্রাহ্মণ-শ্রমণ ও দাস-ভৃত্য-দিগের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু অশোক যে আন্তরিক ধর্ম্মকামনায় এই সকল বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মনে রাখিতে হইবে যে অশোক দুর্ব্বল ও অলস ছিলেন না। যে যুদ্ধে লক্ষ লোক হতাহত হইয়াছিল, সে যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লক্ষ সৈন্য থাকাই সম্ভব। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং বহু রথ, রণতরী ও রণহস্তী ছিল।

অশোকের সময়ে মগধের সেনাবল হ্রাস পাইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেবল এক উৎকট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে তিনি দিগ্বিজয়ের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পুত্র-প্রপৌত্রদিগকে ধর্ম্ম-বিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। প্রবল ধর্ম্মকামতা বা ধর্ম্মরতি না থাকিলে তিনি রাজবংশের চিরাচরিত দিগ্বিজয়ের আদর্শ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, এবং মৃগয়া ও রাজাদিগের অভ্যস্ত অন্যান্য ব্যসনেও বিমুখ হইতেন না। তাঁহার অনুশাসনেই দেখা যাইবে যে ধর্ম্মের প্রসারের জন্য তিনি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে পরাঙ্মুখ হন নাই।

অশোক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি অন্য কোন যশ বা কীর্ত্তি চাহেন না, কিন্তু জন-সাধারণের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মপরায়ণতা সঞ্চারিত হয়, তাহারই যশ ও কীর্ত্তি তিনি কামনা করেন। ধর্ম্মদানের মত দান নাই, সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গল শ্রেষ্ঠ। সকল বিজয়ের মধ্যে ধর্ম্মবিজয় মুখ্যতম। সর্ব্বভূত-হিতই তাঁহার প্রধান কাম্য। শ্রম ও তৎপরতা ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। সুতরাং ভূত-ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি শ্রম ও তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন। যাহাতে সকলে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিতে পারে, তাহাই তাঁহার শ্রমের উদ্দেশ্য।

অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাও তাঁহাদের প্রজাদিগের নৈতিক উন্নতি কামনা করিতেন, কিন্তু তখন জন-সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রসার হয় নাই। অশোক ভাবিলেন, তাহা হইলে আমি কি উপায়ে ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মাইব? কিরূপে ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে ইহাদের উন্নতি হইবে? তিনি স্থির করিলেন যে ধর্ম্ম-কীর্ত্তন করিতে হইবে, ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে হইবে। ধর্ম্ম-কীর্ত্তন শুনিলে, ধর্ম্ম-শিক্ষা লাভ করিলে, লোকের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত

হইবে। বহুলক্ষ প্রজার শাসনকর্ত্তা রাজুকদিগকে ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে অশোক যুক্ত, রাজুক ও প্রাদেশিকদিগকে পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তর রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ বৎসরই প্রজার মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম-লিপি লেখান হইল। পরবৎসর ধর্ম্ম-মহামাত্র নামক এক শ্রেণীর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে এবং সীমান্তস্থিত যোন, কম্বোজ, গান্ধার ও রাষ্ট্রিকদিগের মধ্যেও মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিলেন। গৃহী ও সন্ন্যাসী, সকলের মঙ্গল ও সুখের ব্যবস্থা করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল। নারী-দিগের নৈতিক উন্নতির ভার স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্রদিগের উপর অর্পিত হইল। ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে, দেশে দেশে অশোকের নিয়োজিত প্রচারকেরা তাঁহার ধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া গেলেন। রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপে দিগ্বিজয় পরিহার করিয়া ধর্ম্ম-বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা কেবল বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই, তাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্ম-আচরণ করিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অশোক কেবল কর্ম্মচারীদিগের উপর লোক-শিক্ষার ভার দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অহিংসার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেই সাধারণ লোকের হিংসার প্রবৃত্তি দূর হয় না। সুতরাং প্রিয়দর্শী দেশের রাজা হিসাবে কতকগুলি জীবহত্যা একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। অভিষেকের ষড়্‌বিংশ বৎসরে তিনি শুক, শারিকা, চক্রবাক, হংস, নন্দীমুখ, জতুক (বাদুড়), পিপীলিকা-মাতা (রাণী), কচ্ছপ, সজারু, গণ্ডার, "ধর্ম্মের ষণ্ড", গ্রাম্য কপোত প্রভৃতি কতকগুলি জীবহত্যা একেবারেই নিষেধ করিয়া দিলেন। পৌষ পূর্ণিমায় মৎস্য-হত্যা ও মৎস্য-বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল। গর্ভবতী ছাগী,

মেষী ও শূকরী এবং ছয় মাসের নিম্ন-বয়স্ক শাবক অতঃপর রাজার আদেশে অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। পুণ্যদিনে ষণ্ড, ছাগ, মেষ ও শূকরের পুরুষত্ব-হানি বারণ হইল।

ইতিপূর্ব্বে সাধারণের মধ্যে কতকগুলি উৎসব হইত। হয়ত এই সকল উৎসব উপলক্ষে যে সকল আমোদের ব্যবস্থা ছিল, তাহা সুনীতি-সঙ্গত ছিল না। এখনকার মেলার মত এই সব উৎসবেও হয়ত নানা প্রকারের দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইত। অশোকের আদেশে এই সকল উৎসব বন্ধ হইল। কিন্তু তিনি জানিতেন যে আমোদ-আহ্লাদের সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে রহিত করিয়া দিলে চলিবে না। এই জন্য যাহাতে লোকের মনে ধর্ম্ম-কামনা জাগ্রত হয়, তিনি এমন কতকগুলি উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাহাদিগের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বিমান, দিব্যহস্তী, জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য ও নানা প্রকারের দিব্যরূপ দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ রুচিবাগীশদিগের মত তিনি উৎসব-মাত্রকেই কলুষের হেতু বলিয়া মনে করেন নাই, পরন্তু মানুষের স্বাভাবিক আনন্দলিপ্সার সাহায্যেই ধর্ম্মলিপ্সা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে প্রিয়দর্শী সর্ব্বভূত-হিতের জন্য এত শ্রম, এত উদ্যোগ করিতে পারিতেন না। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর ধার্ম্মিকের পীড়াই তাঁহার অধিকতর ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। কলিঙ্গের ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য সম্প্রদায় এবং গৃহস্থদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা মাতাপিতা, গুরু ও জ্যেষ্ঠদিগের "শুশ্রূষায়" নিরত, এবং মিত্র, পরিচিত জন, সহচর, আত্মীয়, দাস ও ভৃত্যদিগের প্রতি "সম্প্রতিপত্তি"-শীল। কলিঙ্গ-অভিযান-জনিত বধ ও উপঘাতে এই সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, অশোকের বিচারে যুদ্ধক্ষেত্রের

লক্ষ নরহত্যা অপেক্ষাও তাহা অধিকতর শোচনীয়। ধার্ম্মিকের প্রতি এই গভীর সহানুভূতিই অশোকের ধর্ম্মরতির প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। আরব্ধ কার্য্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি না করিলে, তৎপ্রতি প্রবল অনুরাগ না থাকিলে, অশোক বলিতেন না,—আমি বহু কল্যাণ করিয়াছি, আমার পুত্র, পৌত্র এবং পরবর্ত্তী বংশধরেরাও কল্লান্তকাল পর্য্যন্ত যেন এইরূপ কার্য্যই করে ; আমার পুত্র ও পৌত্রেরা যেন নব বিজয় ইচ্ছা না করে, তাহারা যেন মনে রাখে ধর্ম্মবিজয়ই প্রকৃত বিজয় ; ধর্ম্মবিজয়ই ইহলোকে ও পরলোকে ফলপ্রদ।

প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছিল ? এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন। গিরিলেখমালার চতুর্থ অনুশাসনে অশোক বলিতেছেন,—বহুশত বৎসর ধরিয়া প্রাণিবধ, জীবহিংসা, আত্মীয় ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অভদ্রতা প্রচলিত ছিল, অধুনা দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার "ধর্ম্মচরণ"-হেতু ভেরীঘোষ ধর্ম্মঘোষে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের কুনীতি দূর হইয়া সুনীতির প্রচলন হইয়াছে। ত্রয়োদশ অনুশাসনে তিনি বলিতেছেন,—দেশে বিদেশে বহুলোক তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ; তিনি ধর্ম্মবিজয়কেই মুখ্যতম বিজয় বলিয়া মনে করেন ; এদেশে এবং প্রত্যন্ত দেশসমূহে তিনি এইরূপ বিজয় বহুবার লাভ করিয়াছেন, এমন কি ছয়শত যোজন দূরে, যেখানে অংতিয়োক নামক যোন রাজা রাজত্ব করেন এবং তাঁহার রাজ্যের বাহিরে যে সকল দেশে তুরময়, অংতিকিনি, মক এবং অলিকসুদর নামক চারিজন রাজা রাজত্ব করেন, দক্ষিণে চোল-পাণ্ড্য এবং তাম্রপর্ণী (সিংহল) পর্য্যন্ত সকল রাজ্যে, তথা রাজার নিজরাজ্যের ভিতরে যোন-কম্বোজদিগের মধ্যে, নাভক-নাভপন্তিদিগের মধ্যে, ভোজ-পিতিনিকদিগের মধ্যে, অন্ধ্র-পারিন্দদিগের মধ্যে,—সর্ব্বত্র ধর্ম্মানুশাসন অনুসৃত হইতেছে ; এমন কি যাঁহাদের নিকট তাঁহার

দূতেরা যায় নাই, তাঁহারাও এই ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মবিধানের কথা শুনিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেছেন এবং করিবেন ; সর্ব্বত্র বহুবার লব্ধ এই বিজয় (ধর্ম্মবিজয়) বাস্তবিকই প্রীতিকর।

অশোক যে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য এন্টিয়োকস্, টলেমি, এন্টিগোনস্ প্রভৃতি গ্রীক রাজাদিগের দেশে ও দক্ষিণ সীমান্তের চের, চোল, সিংহল প্রভৃতি রাজ্যে দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীক রাজারা যেমন পাটলিপুত্রের রাজদরবারে দূত পাঠাইতেন, পাটলিপুত্রের মৌর্য্য রাজগণও তেমনই গ্রীক রাজাদিগের রাজধানীতে দূত পাঠাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাদের প্রচারের ফলে এই সকল দেশে অশোকের ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে কতটা সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন। অশোকের ধর্ম্মবিজয়ের বিবরণে কিছু কিছু অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নহে। তিনি দূতগণের নিকট যেরূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাই লিখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু অশোকের উপদেশগুলি এমন সরল ও এমন উদার যে, সকল দেশে, সকল সমাজে তাহার আদর হওয়াই স্বাভাবিক। সত্য, দয়া, সংযম, ভাব-শুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা কোন্ দেশ, কোন্ জাতি, কোন্ সমাজ অস্বীকার করিবে ? সিংহলের প্রাচীন গ্রন্থ ও অবদান হইতে জানা যায় যে, অশোকের প্রচারকদিগের চেষ্টায়ই সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও প্রসার হইয়াছিল। কিন্তু এইখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে, অশোক কি বৌদ্ধ ছিলেন ?

অশোক যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহাতে এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুশাসনেই তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ রহিয়াছে। একদা পণ্ডিত-সমাজে কাহারও কাহারও এই ধারণা ছিল যে, অশোক পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সন্তানের পক্ষে পিতামাতার আজ্ঞাপালন, কনিষ্ঠের পক্ষে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাপালন, শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের আজ্ঞাপালন, ব্রাহ্মণ ও

শ্রমণদিগের প্রতি যোগ্য সম্মান-প্রদর্শন, যোগ্য পাত্রে দান—কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মমতে নহে, হিন্দু শাস্ত্রমতেও অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য। শান্তি ও তৃপ্তির জন্য অহিংসা, মার্দব ও আত্মপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকল ধর্ম্মই স্বীকার করে। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন করিলে, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন করিলে, পারিবারিক শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে ; পিতামাতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা থাকিলে এবং দাস ও ভৃত্যদিগের প্রতি প্রভু ভদ্র ব্যবহার করিলে, সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা অল্প ; নিম্নপদস্থ ব্যক্তি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের অবকাশ থাকে না। অতএব এই সকল সাংসারিক-অভিজ্ঞতা-লব্ধ নীতি-প্রচারের সহিত কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। পণ্ডিত-সমাজে এই যুক্তিই তখন প্রবল ছিল।

কিন্তু অশোকের অনুশাসনেই প্রকাশ যে তিনি কনকমুনি-বুদ্ধের স্তূপ সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সম্বোধি ও লুম্বিনীতে ধর্ম্মযাত্রা করিয়াছিলেন। এই দুইটিই বৌদ্ধ তীর্থস্থান। স্তূপ-সংস্কারের যুক্তি সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। অশোক ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, আজীবিক ও নির্গ্রন্থ (জৈন) দিগকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি যেমন কনকমুনি-বুদ্ধের স্তূপ সংস্কার করিয়াছিলেন, তেমনই আজীবিকদিগকেও বাসের নিমিত্ত তিনটি গুহা দান করিয়াছিলেন। শিবাজী মুসলমানদিগের ধর্ম্মস্থানে প্রদীপ দিবার জন্য নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন না। টিপু সুলতান শৃঙ্গেরীর মঠ-সংস্কারের জন্য অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু হইয়া যান নাই। সুতরাং কনকমুনি-বুদ্ধের স্তূপ সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই যে অশোক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন কথা মনে করা যায় না। সম্বোধি-গমনের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, গয়া হিন্দুরও

তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু রুম্মিন্‌দেঈর স্তম্ভলিপি পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে রাজা প্রিয়দর্শী শাক্যমুনি-বুদ্ধের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থানে গিয়া তিনি কেবল অর্চ্চনা ও স্তম্ভ-স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি লুম্বিনী গ্রামের রাজস্ব আংশিক মাপ করিয়া আসিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত অশোকের হস্তীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তিনি দিব্যহস্তী দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল্‌সীতে অশোকলিপির পার্শ্বেই গিরিগাত্রে হস্তীর একটি সুন্দর রেখাচিত্র আছে। তাহার নীচে লেখা আছে "গজতমে" বা গজশ্রেষ্ঠ। ধৌলির অশোক-লিপির উপরিভাগে পাথর কাটিয়া হস্তিদেহের পুরোভাগ রচিত হইয়াছে। গিরনারে হস্তীর মূর্ত্তি বা চিত্র নাই, কিন্তু ত্রয়োদশ অনুশাসনের নীচে একটি লেখার অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে "..... র্বস্বেতো হস্তি সর্বলোক-সুখাহরো নাম"। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে গৌতম মাতৃগর্ভে আসিবার কালে শ্বেত হস্তীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব হস্তী, বিশেষতঃ শ্বেত হস্তী, বৌদ্ধদিগের চক্ষে অতি পবিত্র। সুতরাং কাল্‌সীর "গজতমে", গিরনারের "সর্ব্বলোক-সুখাহরো" শ্বেতহস্তী এবং ধৌলির হস্তিমূর্ত্তি অশোকের বুদ্ধ-ভক্তিরই পরিচয় দিতেছে। অশোকের অনেক স্তম্ভ-শীর্ষে কোথাও বা একটি, কোথাও বা একাধিক সিংহ-মূর্ত্তি দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে ঐ সকল সিংহ-মূর্ত্তি শাক্যসিংহেরই প্রতীক। অশোক সারনাথে স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। সারনাথে ভগবান্ বুদ্ধ প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন। এইখানেই তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। সারনাথের স্তম্ভশীর্ষে সিংহ-চতুষ্টয়ের মধ্যে একটি চক্র ছিল। ইহাকে ধর্ম্মচক্রেরই প্রতিরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। অশোকের একটি শিলাস্তম্ভের শীর্ষে বৃষমূর্ত্তি এবং অন্য স্তম্ভে অশ্বের চিত্র আছে। বৃষ বুদ্ধের জন্ম এবং

অশ্ব তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ দ্যোতনা করিতেছে। অশোকের শিলাস্তম্ভে সিংহ, বৃষ, অশ্ব ও ধর্ম্মচক্রের সমাবেশ একেবারে আকস্মিক ও নিরর্থক বলিয়া মনে করা যায় না।

এই প্রমাণও অনুমানসাপেক্ষ বলিয়া অগ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপির কৌশাম্বী-অনুশাসনে ও সারনাথের স্তম্ভলিপিতে যখন দেখি যে তিনি সঙ্ঘের শৃঙ্খলা ও ঐক্যের কথা উত্থাপন করিতেছেন, যখন কলিকাতা-বৈরাট লিপিতে দেখি যে, তিনি সঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া বলিতেছেন,—বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের প্রতি আমার কিরূপ গভীর আস্থা এবং শ্রদ্ধা তাহা আপনারা অবগত আছেন,—এবং যখন মস্‌কি লিপিতে তাঁহাকে বলিতে দেখি,—কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর হইল আমি বুদ্ধ-শাক্য হইয়াছি,—তখন প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ভগবান্ বুদ্ধের সুভাষিতাবলীর কোন্ কোন্‌টি অশোক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন, কলিকাতা-বৈরাট লিপিতে তিনি তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত সাতটি বুদ্ধ-ভাষিত "ধর্ম্ম-পর্য্যায়" ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের, তথা উপাসক ও উপাসিকাগণের, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন করা উচিত :— (১) "বিনয়-সমুকসে", (২) "অলিয়-বসাণি" (অঙ্গুত্তর নিকায়), (৩) "অনাগত-ভয়ানি" (অঙ্গুত্তর নিকায়), (৪) "মুনি-গাথা" (মুনি-সুত্ত—সুত্তনিপাত) (৫) "মোনেয়-সূতে" (নালক-সুত্ত—সুত্তনিপাত), (৬) "উপতিস-পসিনে" (মজ্‌ঝিম নিকায়ের রথবিনীত-সুত্ত), এবং (৭) "লাঘুলোবাদে" (মজ্‌ঝিম নিকায়ের রাহুলোবাদ-সুত্ত)।

অশোকের পিতা ও পিতামহ বৌদ্ধ ছিলেন না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে, কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহারা সাধারণতঃ

পরধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হইয়া থাকে। কিন্তু অশোকের আচরণে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়। তাঁহার মহামাত্রেরা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, আজীবিক, নিগ্রর্ন্থ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদিগের হিত-সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অনুশাসনে সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে সম্মান ও দানের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্য ধর্ম্মের বিরোধী কোন বিধান অনুশাসনে দেখা যায় না। সাধারণভাবে জীবহিংসা নিষেধ হয়ত যজ্ঞে পশু-বলির বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু স্তম্ভলেখমালার পঞ্চম অনুশাসনে যে সকল জীবজন্তু অবধ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের একটিও যজ্ঞে বলি দিবার যোগ্য নহে। রোগে, বিবাহে, জাতকর্ম্মে, যাত্রাকালে সাধারণ লোকেরা কতকগুলি মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গিরিলেখমালার নবম অনুশাসনে অশোক এই সকল মঙ্গলকর্ম্ম নিষ্ফল ও নিরর্থক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ নারী-জাতিরই এই সকল মঙ্গলকর্ম্মে অধিকতর আগ্রহ দেখা যায়। এখানে তিনি ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম বা হিন্দু সমাজের প্রতি বিশেষ করিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সকল সমাজের ও সকল সম্প্রদায়ের নারীদিগের মধ্যেই অল্প বিস্তর কুসংস্কারের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অশোক যে অনুষ্ঠানগুলির নিন্দা করিয়াছেন, তাহা যে হিন্দু বা জৈন সমাজের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ গৃহস্থদিগের মধ্যে ছিল না, এমন কথা অন্ততঃ অশোকের ধর্ম্মলিপিগুলির মধ্যে কোথাও নাই। সুতরাং মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, এখানে তিনি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কতকগুলি প্রচলিত লৌকিক আচারেরই নিন্দা করিয়াছেন, অপরের ধর্ম্ম বা অন্য সমাজের নিন্দা করেন নাই।

গিরিলেখমালার সপ্তম অনুশাসনে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা বলিয়াছেন যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে তাঁহার

রাজ্যের সর্ব্বত্র বাস করিতে পারে, তাহাই তিনি ইচ্ছা করেন। দ্বাদশ অনুশাসনে তিনি তাঁহার প্রজাগণকে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদিগকে বিবিধ দান ও পূজা দ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন। কিন্তু দান ও পূজা সম্বন্ধে তিনি সেরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না যেরূপ সকল সম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি (ধর্ম্মমতের সার বস্তুর উপলব্ধি) ইচ্ছা করেন। বহুবিধ উপায়ে ইহা হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ বাক্-সংযম প্রয়োজন। অকারণে নিজ সম্প্রদায়ের স্তুতি ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করা উচিত নহে, বরঞ্চ সর্ব্বদা অপর সম্প্রদায়ের প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং অপর সম্প্রদায়ের উপকার করা হয়।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, অশোকের নিকট সকল সম্প্রদায়ই সমান পূজা ও দান লাভ করিয়াছে। তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও কোন ধর্ম্মের বা কোন সম্প্রদায়ের অনাদর করেন নাই, উৎপীড়ন ত দূরের কথা। তিনি উপদেশ দিয়াছেন যে সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বা মূলনীতি উপলব্ধি করিবে।

অশোক পরলোকে বিশ্বাস করিতেন। অনুশাসনে অনেক স্থানে পরলোকের কথা, পারলৌকিক মঙ্গলের কথা, স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে। গিরিলেখমালার দশম অনুশাসনে আছে যে, প্রিয়দর্শী রাজা যাহা কিছু করিতেছেন সমস্তই পারত্রিক মঙ্গলের জন্য। রাজার কেবল পরলোকের কথা চিন্তা করিলে চলে না। কোটি কোটি লোকের সুখদুঃখের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। ইহলোকের প্রতি তিনি উদাসীন হইলে দেশে অরাজকতা হইবে, প্রবলের হাতে দুর্ব্বল উৎপীড়িত হইবে, প্রজার ধন ও জীবন নিরাপদ রহিবে না। শান্তিপ্রিয়, পূতচরিত্র রাজা দেশের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন নাই,

ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং পরলোকের চিন্তায় অশোক ইহলোকের কর্ত্তব্যে বিমুখ হইয়াছিলেন কি না, ব্যক্তিগত ধর্ম্মের সহিত তিনি রাজধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন কি না, এ প্রশ্নের আলোচনা করা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন। অশোক জীবহিংসা হইতে যথাসাধ্য নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম হিসাবে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ-অভিযানের ফলে হতাহত ও দেশান্তরিত নরনারীর পরিজনদিগের দুঃখে তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অতঃপর ইহার শতাংশ, এমন কি সহস্রাংশ, লোকের ঈদৃশ পীড়াও প্রিয়দর্শীর পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্মলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোথাও এমন কথা নাই যে, কোন কারণেই কাহারও প্রাণদণ্ড কিংবা কারাদণ্ড হইবে না। বরঞ্চ অশোক যে প্রাণদণ্ড ও কারাদণ্ড নিষেধ করেন নাই, অনুশাসনে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। স্তম্ভলেখমালার চতুর্থ অনুশাসনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগকে তিন দিন সময় দিবার বিধান রহিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত রাজুকদিগের নিকট আবেদন করিতে পারিতেন, অথবা আত্মীয়-স্বজনের অভাবে দণ্ডিত ব্যক্তি ঐ তিন দিন দান ও উপবাস প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পরলোকের কল্যাণের উপায় করিতে পারিত। ধৌলি ও জৌগড়ের প্রথম অতিরিক্ত অনুশাসনে অশোক বলিতেছেন, —"কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি কখনও কখনও কঠোর ব্যবহার করা হয়; কখনও কখনও এমন হয় যে, একজন দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে, আর অপর অনেকে দণ্ড ভোগ করিতে থাকে। মহামাত্রেরা এরূপ ক্ষেত্রে সকলের প্রতি অপক্ষপাতিত্ব দেখাইবেন। ঈর্ষা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অনভিজ্ঞতা, আলস্য ও ক্লান্তির জন্য এরূপ

হয়। অতএব তাঁহারা এই সকল দোষ বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবেন।” স্তম্ভলেখমালার পঞ্চম অনুশাসনের শেষে অশোক বলিতেছেন, “আমি এযাবৎ পঞ্চবিংশতিবার বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছি।” এই অনুশাসনে অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বৎসরের কথা লেখা হইয়াছে, এবং এই অনুশাসনেই শুক, শারিকা, কমঠ, শুশুক প্রভৃতি জীবের হত্যা নিষেধ করা হইয়াছে। যদি তিনি নিজরাজ্যে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড রহিত করিতেন, তাহা হইলে অনুশাসনেই তাহা বলা হইত। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি পঞ্চবিংশতিবার বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি যোগ্য ক্ষেত্রে অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড নিষেধ করেন নাই। বিচার-কার্য্যে পক্ষপাতিত্বের তিনি নিন্দা করিয়াছেন, এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য, অন্যথা তাহাদিগের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য, তিনি তাহাদিগকে তিন দিন সময় দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বে বৎসরে একবার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেওয়া হইত। তিনি লঘুদণ্ডের পক্ষপাতী ছিলেন।

অনুশাসনের প্রমাণ হইতে জানা গেল যে, প্রিয়দর্শী অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের লোক-দিগকে তিনি বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার। তাহা সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য এবং সকল ধর্ম্মের মূলনীতি হইতে সঙ্কলিত। বুদ্ধ-শাক্য অশোক যেমন বলিয়াছেন—

“সাধু মাত-পিতিসু সুসুসা মিত-সংথুত-নাতিক্যাণং চা বংভন-সমনানং চা সাধু দানে পানানং অনাংলভে সাধু” (গি—লে, ৩, কাল্‌সী)—

তিনি যেমন “গুরুনংসুশ্রুষ” (গি—লে, ১৩, শাবাজগড়ী) ধর্ম্মের

অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি যেমন বলিয়াছেন,—"অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংম-মংগলে" (গি—লে, ৯, গিরনার), তিনি যেমন সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তেমনই ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরাও বলিয়াছেন—

"ওঁ ধর্ম্মং চর, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি, ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, ওঁ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।"

প্রাচীন হিন্দুদিগের মতেও—

"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"।

অশোকের ধর্ম্মে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন উদার ধর্ম্মমতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি দেশে বিদেশে এই ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের নির্দ্দেশ পালন করিতে গিয়া তিনি রাজধর্ম্মের অপলাপ করেন নাই। রাজার কর্ত্তব্যের সহিত তিনি গৃহীর কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। তিনি দণ্ডের সহিত ক্ষমার, শক্তির সহিত সংযমের, এবং আদর্শের সহিত বাস্তবের ঐক্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬

উপসংহার

এতক্ষণে আমরা রাজা অশোকের, ধর্ম্মোপদেষ্টা অশোকের পরিচয় পাইলাম। সকল বিভূতি বাদ দিলে যে মানুষটি থাকে, তাহার পরিচয় পাইবার কি কোন উপায় আছে? মানুষের পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় তাহার কাজে, কতকটা তাহার ব্যবহারে। আধুনিক কালের বড় লোকদিগের চরিত্র বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। হাজার হাজার চিঠি পত্রে তাহাদের মনের ছাপ রহিয়াছে। সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের রোজনামচায় অপরে তাহাদের সম্বন্ধে কি মনে করিত, তাহার আভাস হয়ত পাওয়া যাইবে। বহু ক্ষেত্রে পত্নী, পুত্র অথবা এমনই কোন নিকট আত্মীয়, সুহৃদ্ ও বন্ধুরা হয়ত তাঁহার জীবনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং একালের বড় লোকদিগের জীবন-চরিতের উপকরণ যেমন প্রচুর তেমনই বিচিত্র ও নির্ভরযোগ্য। অশোকের কোন সমসাময়িক জীবনকথা পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ লেখকেরা যে সকল অবদান রচনা করিয়াছেন, তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা বলা কঠিন। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অশোকের চরিত্র অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, স্বজনহন্তা চণ্ডাশোক বুদ্ধের কৃপায় কেমন করিয়া হঠাৎ ধর্ম্মাশোকে পরিণত হইলেন, তাহাই পরবর্ত্তী কালের অবদান-সমূহের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এই সকল অবদানে আমরা সর্ব্বদা সত্যের সন্ধান নাও পাইতে পারি। অবদান ও কিংবদন্তী বাদ দিলে বাকী থাকে অশোকের ধর্ম্মলিপি ও স্তম্ভ এবং গুহা কয়টি। শিল্পের ভিতর দিয়া যেমন শিল্পীর মনের

পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই তাহার পুরস্কর্ত্তা ও পৃষ্ঠপোষকের রুচিরও পরিচয় পাওয়া যায়। চীন দেশের পরিব্রাজকেরা বিভিন্ন সময়ে অশোকের যে সকল স্তূপ ও প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক যে প্রাসাদে বাস করিতেন, তাহা এখন কুমরাহারের মৃত্তিকাতলে লুপ্ত। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের চেষ্টায় তাহার গুটি কয়েক শিলাস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। প্রাসাদের আয়তন ও রচনারীতি সম্বন্ধেও যে কতকটা অনুমান না করা যায় তাহা নহে। কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু সম্ভব নহে। সুতরাং সেই সময়ের শিল্পের ভিতর দিয়া যদি আমরা তাঁহার রুচির পরিচয় লইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কয়েকটি শিলাস্তম্ভ, গিরিগুহা এবং গিরিলিপিই আমাদের একমাত্র সম্বল।

অশোকের সময়ে যে তক্ষণ শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাথরের পালিশের কাজেও মৌর্য্য শিল্পীরা বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাই ষোল শত বৎসর পরেও সুলতান ফিরুজ অশোকের লাটের শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত যে কয়টি অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভগ্ন। স্তম্ভের শীর্ষে কোথাও হস্তী, কোথাও অশ্ব, কোথাও বৃষ, কোথাও সিংহ, কোথাও বা শিলাময় ধর্ম্মচক্র রচিত, ছিল। তাহাদের আসনের নিম্নভাগ কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন পারস্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে নিম্নমুখী ঘণ্টার অনুকরণে, কাহারও কাহারও মতে অর্দ্ধ-উন্মেষিত শতদলের অনুকরণে পরিকল্পিত। তাহারই নীচে কোথাও বা খাদ্যান্বেষণ-রত হংসযুথ ও ধর্ম্মচক্র, কোথাও শতদল ও অন্য পুষ্প। সারনাথে সিংহ-চতুষ্টয়ের আসন সিংহ, গজ, বৃষ ও অশ্বের মূর্ত্তিতে পরিশোভিত। রুম্মিনদেঈ-স্তম্ভের শীর্ষে নাকি অশ্ব-মূর্ত্তি ছিল, এখন আর নাই, বজ্রাঘাতে লাটের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঘোড়াও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রামপুরবার স্তম্ভ-চূড়ার বৃষ

রামপুরবার অশোক স্তম্ভের বৃষ

মৌর্য্যশিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন। অশোকের স্তম্ভের পশুগুলি যেমন জীবন্ত ও ভাবব্যঞ্জক তেমনই শক্তি ও মহিমাদ্যোতক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন ইংরেজ শিল্পী এলাহাবাদ-স্তম্ভের জন্য একটি সিংহ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে গিয়া উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন। মৌর্য্যশিল্পী-রচিত সিংহের তুলনায় ইংরেজশিল্পী-পরিকল্পিত সিংহ ক্ষুদ্রকায় "পুড্‌ল্‌" কুকুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অশোকের স্তম্ভগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহা একদিকে যেমন সুঠাম, অন্যদিকে তেমনই অলঙ্কারের বাহুল্য-বর্জ্জিত। প্রত্যেকটি পশু, পক্ষী ও পুষ্প নিপুণতার সহিত নির্ম্মিত, আর স্তম্ভের শীর্ষে কিংবা পাদমূলে কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সজ্জা নাই। স্তম্ভের শোভা তাহার মসৃণতায়। এই মসৃণতা বরাবর-গিরিগাত্রে খোদিত গুহার প্রাচীরেও দৃষ্ট হয়। অশোকের ধর্ম্মলিপিগুলিও পাথর চাঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর পরিচ্ছন্ন-ভাবে লেখা। কাল্‌সীর হস্তীর চিত্রে অনাবশ্যক একটি রেখাও নাই। তখনকার শিল্পের সামঞ্জস্য ও বাহুল্যহীনতা বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয়। মানুষের জীবনে অশোক যেমন আতিশয্য পছন্দ করিতেন না, শিল্পেও তেমনই তিনি কোথাও আতিশয্যের বা অনাবশ্যক অলঙ্কারের প্রশ্রয় দেন নাই। শাহজাহানের সৌধাবলীর ও অশোক-স্তম্ভের সহিত অন্য কোন দিক দিয়া হয়ত তুলনা হয় না, কিন্তু একথা স্বতঃই মনে হইবে যে, এই দুই বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্পের পুরস্কর্ত্তা ও পৃষ্ঠপোষকেরাও বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন রুচির লোক ছিলেন।

অশোকের শিল্পে যেমন, তাঁহার অনুশাসনের ভাষায়ও তেমনই অসাধারণ সংযম দেখা যায়। ধর্ম্মলিপির কোথাও অনাবশ্যক কোন বিশেষণ নাই, প্রিয়দর্শী সর্ব্বত্র সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। অলঙ্কারের ভারে তাঁহার ভাষা আড়ষ্ট হয় নাই, সজ্জার বাহুল্যে তাঁহার শিল্প বিকৃত হয় নাই। সুতরাং

মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, অশোকের জীবন ছিল নিতান্তই সরল এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনও আড়ম্বরের প্রশ্রয় দেন নাই। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি হয়ত ছোট একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। তাহাতে সজ্জার বাহুল্য না থাকিলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সামান্য উপকরণের শোভার জন্য হয়ত সকলেই গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা করিত। তিনি নিশ্চয়ই অল্পভাষী ছিলেন এবং আত্মীয়-পরিজন ও পোষ্যগণের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। আদর্শবাদী লোকেরা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ হইয়া থাকেন, সুতরাং অশোকের চরিত্রেও বোধ হয় এই ভাবপ্রবণতা বিশেষ ভাবেই দেখা যাইত। সে সময়ের প্রচলিত কুসংস্কার হইতে তিনি বোধ হয় মুক্ত ছিলেন। পীড়ার কারণে বা বিবাহোপলক্ষে বা যাত্রাকালে হয়ত তাঁহার গৃহে তৎকাল-প্রচলিত নিরর্থক মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইত না। তিনি পরিশ্রম ও তৎপরতার সহিত আপনার কর্ত্তব্য কাজগুলি করিয়া যাইতেন, কিন্তু জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সমাধানের চেষ্টা বোধ হয় তিনি করিতেন না। অনুশাসনের কোথাও তিনি দার্শনিক তত্ত্বের বা যুক্তির অবতারণা করেন নাই। ব্রাহ্মণ-শ্রমণদিগকে তিনি সাধ্যমত দান করিতেন। পরলোকে তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং স্বর্গ-কামনাও তাঁহার ছিল। দেবদেবীদিগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, কিন্তু তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য দিব্যরূপ-সমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব বিনয় বোধ হয় তাঁহার ছিল না। অনুশাসনের কোথাও "মুই অতি ছার"-ভাব নাই। বরঞ্চ তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আত্মপ্রসাদ-সহকারেই উল্লেখ করিয়াছেন।

মানুষ হিসাবে অশোক কেমন ছিলেন আলোচনা করা গেল। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি কি করিতেন, তাহা

কল্পনা করিয়া লাভ নাই। কারণ তাঁহার জন্ম হইয়াছিল "আসমুদ্র-ক্ষিতীশের" প্রাসাদে। বাল্য জীবনে তিনি কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন আমরা জানিনা। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সময়ের কথা তিনি অনুশাসনে যেরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে করা অন্যায় হইবে না যে, তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনের আদর্শ ও আচরণের অনুকূল ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি সন্ন্যাস লইয়াছিলেন কি না, সে প্রশ্নের বিচার এখানে না করিলেও চলে। যদি পিতামহের মত তিনি অপ্রতিহত প্রতাপে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া যাইতেন, যদি তিনি পরবর্ত্তী কালের শুঙ্গ ও গুপ্ত নৃপতিগণের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া নিজের শক্তি ও সম্পদের খ্যাতি প্রচার করিতে চাহিতেন, যদি শত্রু-নারীগণের বলাপ তাঁহার চারণগণের উল্লাস বৃদ্ধি করিত, তাহা হইলে বোধ হয় মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠা ও সম্পদের সহিত তাঁহার আচরণের অসঙ্গতি হইত না। কিন্তু কলিঙ্গের লক্ষ-নরশোণিতসিক্ত তরবারি চোল, চের, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণীর কোটিনররুধিরপানে প্রবৃত্ত না হইয়া হঠাৎ বিজয়ের দীপ্ত মুহূর্ত্তে কোষবদ্ধ হইল। রণতূর্য্য, রণভেরী সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। অশোক দিগ্বিজয়-যাত্রা বন্ধ করিয়া অহিংসা ও শান্তির পথ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেবল আর একজন রাজপুত্র, কপিলাবস্তুর শাক্য রাজকুমার, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া মুক্তির পথ, নির্ব্বাণের পথ অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। অশোকের পরে মাত্র আর দুইজন মহামানব পৃথিবীতে প্রেমের ও শান্তির বাণী প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বেথ্‌লেহেমের সূত্রধর-পুত্র যীশু ও নবদ্বীপের ব্রাহ্মণকুমার নিমাই, উভয়েই পরাধীন জাতির লোক, রাজনীতির ভাষায় "দাস-জাতি"র মানুষ। একালের দর্শনের মতে দুর্ব্বল দাস-জাতিই ইহলোকে বিমুখ হইয়া পরলোকের মঙ্গলের

আকাঙ্ক্ষায় কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হয়। আঘাত করিবার শক্তি ও সাহস যাঁহাদের নাই, তাঁহারা ক্ষমা ও প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাই যীশুর তিরোধানের বহু পরে রাজার জাতি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিকৃত করিয়াছে, আর চৈতন্যের ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত কোন শক্তিমান্ রাজার জাতি গ্রহণ করে নাই। অশোক দুর্ব্বল ছিলেন না। যিনি লক্ষ নরবলি দিয়া কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন তিনি যে আরও লক্ষ বলি দিয়া তাম্রপর্ণী পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। দিগ্বিজয়ের পথ হইতে সহসা এরূপ ভাবে কোন সম্রাট্ অহিংসার পথে আসিয়াছেন কিনা জানি না। ধার্ম্মিক রাজা হয় ত আরও হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা কয় জন করিয়াছেন জানি না। করিয়াছিলেন বাদশাহ আকবর, তাই তাঁহার অনুরক্ত প্রজাগণ দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বরের আসন দিয়াছিল। কিন্তু তিনিও রাজ্যলিপ্সা ত্যাগ করিয়া শান্তির পথ, অহিংসার পথ, সর্ব্বভূতের কল্যাণের পথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা করিলে, অশোক আলেকজাণ্ডার, সীজার ও নেপোলিয়নের মত বীরখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন কি না, সে কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। নেপোলিয়নের প্রতিভা না থাকিলেই যে নেপোলিয়নের মত রাজ্যলিপ্সা থাকিবে না, এমন বলা যায় না। এখানে বিচারের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিশ্বের ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষের অধিকতর হিত-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, না দিগ্বিজয়-বিমুখ অশোক তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক নরহিতৈষী ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

অশোক চাহিয়াছিলেন পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তি স্থাপন করিতে, সমাজ হইতে হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, উপঘাত দূর করিতে। তাঁহার

বিশাল হৃদয়ের ব্যাপক স্নেহ সমস্ত জীব-জগতের কল্যাণ-কামনায় নিরত ছিল। এরূপ মহাপুরুষের জন্ম কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব, কারণ ভারতের ঋষিগণ কখনও বিশ্বাস করেন নাই যে, জীব-কল্যাণের ব্যত্যয়ে মানব-কল্যাণ হইতে পারে। ভারতের তপোবনে যে শান্তি-বচন পঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে চেতন, অচেতন, কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রাচীন ঋষিরা সর্ব্বজীবের, সর্ব্বলোকের শান্তি কামনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, সমস্ত লোক, সমস্ত জীব এক অজ্ঞেয় নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ। তাই একদিন ভারতের ঋষিকণ্ঠে উদাত্ত স্বরে গীত হইয়াছিল—

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ
অন্তরীক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিঃ
আপঃ শান্তিঃ
বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ
বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ
ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্ব্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি।

অশোক বৌদ্ধ হইলেও ভারতবর্ষের সন্তান। প্রাচীন ঋষির এই শান্তি-বচনের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরোধ নাই। নর ও পশু, সর্ব্বজীবের, সর্ব্বভূতের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়া অশোক পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, তাই জগতে এত অশান্তি। আজ আকাশ মৃত্যুর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বাতাস মৃত্যুর বাষ্পে বিষাক্ত, সলিলে হত্যার বিভীষিকা, বনস্পতি মারণ-যন্ত্রের আশ্রয়,—জলে,

স্থলে, অন্তরীক্ষে আজ হত্যার অবাধ লীলা চলিতেছে। আজ শান্তি কোথায়? কল্যাণ কোথায়? মঙ্গল কোথায়? স্বার্থের সংঘাতে লোভ আজ হত্যার উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কে ইহাকে শান্ত ও সংযত করিবে? দুর্ব্বলের অহিংসা এই হিংসার পদতলে পিষ্ট হইয়া, দলিত হইয়া, মরিয়া যাইবে। এমন কোন দিগ্বিজয়ী বীর কি এখন নাই, যিনি অশোকের আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন? এখন কি এই হত্যা-সমাচ্ছন্ন, হিংসা-ক্ষুব্ধ, লোভ-জর্জ্জরিত পৃথিবীর বুকে আর কোনও ধর্ম্মবিজয়ী রাজর্ষির আবির্ভাব হইবে না? যদি না হয়, তাহা হইলেও পৃথিবী হইতে অশোকের বাণী, অশোকের আদর্শ, অশোকের ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইবে না। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে রাজর্ষি কলিঙ্গবিজয়ের নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণের পথে, শান্তির পথে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কথা শান্তিকামী মানুষ হত্যা ও হিংসায় বিব্রত হইয়া একদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।